

তখনও বঙ্গসাহিত্যাকাশে মধুসূদন-সূর্যের উদয় হয়নি—কিন্তু কেউ কেউ নাটক রচনা করে নবনাট্য আন্দোলনের নান্দীপাঠ শুরু করেছিলেন। এই সমস্ত নাটকের অধিকাংশই অভিনীত হয়নি, অনেকগুলির কিছুমাত্র নাট্যলক্ষণ ছিল না। কিন্তু একজন পুরাতনপন্থী সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিত এই যুগে এমন কয়েকখানি নাটক ও প্রহসন লিখেছিলেন যার সাহিত্যমূল্য যেমন হোক, অভিনয়ে এগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আমরা রামনারায়ণ তর্করত্নের (ভট্টাচার্য) কথা বলছি। অনেকগুলি নাটক লিখে, সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ করে এবং প্রহসনে হাত দিয়ে এই সেকেলে ধরনের সংস্কৃত-জানা পণ্ডিত ‘এ-যুগের কলকাতা’ এবং শহরতলিকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। তাঁকে সবাই ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’র নাট্যকার বলে জানে। কিন্তু এছাড়াও তিনি আরও নানা ধরনের নাটক লিখেছিলেন, প্রহসনেও তাঁর দক্ষতা মন্দ ছিল না। পুরানো যুগের এই নাট্যকারের ‘রত্নাবলী’র অভিনয়-আসরে নিমন্ত্রিত হয়ে মাইকেল মধুসূদনের মনে সর্বপ্রথম বাংলা নাটক রচনার স্পৃহা জাগ্রত হয়।

রামনারায়ণের দুটি নাটক ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ (১৮৫৪) এবং ‘নবনাটক’ (১৮৬৫) যথাক্রমে কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহের কুফল দেখাবার জন্যই লেখা হয়েছিল। প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি নাটক দু-খানির রচনার জন্য পুরস্কার পেয়েছিলেন। তর্করত্ন ইংরেজি জানতেন না, পাশ্চাত্য নাটক সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন বলেই মনে হয়। সংস্কৃত নাটক-প্রহসনেই তাঁর ছিল অবাধ অধিকার—এবং তাঁর নাটক পাশ্চাত্যের নয়, প্রাচ্যের নাট্যকলারই একান্ত অনুসরণ। তিনি কয়েকখানি সংস্কৃত নাটকের (‘বেণীসংহার’—১৮৫৩, ‘রত্নাবলী’—১৮৫৮, ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম্’—১৮৬০, ‘মালতীমাধব’—১৮৬৭) অনুবাদ করেছিলেন—সেই অনুবাদের কিছু কিছু অভিনয়ও হয়েছিল। অভিনয়গুলি ভালো হয়নি, মধুসূদন রত্নাবলীর অভিনয় দেখে মোটেই খুশি হতে পারেননি। তর্করত্ন পৌরাণিক বিষয় নিয়ে তিনখানি মৌলিক নাটকও লিখেছিলেন (‘রুক্মিণীহরণ’—১৮৭২, ‘কংসবধ’—১৮৭৫, ‘ধর্মবিজয়’—১৮৭৬)। কিন্তু তাঁর খ্যাতি প্রধানত নির্ভর করছে ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ এবং কয়েকখানি প্রহসনের ওপর (‘যেমন কর্ম তেমন ফল’, ‘চক্ষুদান’, ‘উভয় সঙ্কট’)। ‘নবনাটক’ নাটক হিসেবে আদৌ জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি, কিন্তু ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ প্রথম নাটক—যা অসাধারণ অভিনয়-সাফল্য লাভ করেছিল। নাটকের কাহিনী ও চরিত্র এমন কিছু প্রশংসার যোগ্য নয়। কিন্তু সাধারণ লোকের চরিত্র, ভাষা ও

১. এটি শ্রীহর্ষের নামে চললোও কে এর প্রকৃত নাট্যকার তাই নিয়ে কিছু সংশয় আছে।

ভঙ্গিমায় তর্করত্ন যে হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গ ও বাস্তবতার আমদানি করেছেন, শুধু সে জন্যই এই নাটক সেযুগে বহুবার অভিনীত হয়েছিল। এমনকি এই নাটকের অভিনয় দেখে কুলীনের দল তর্করত্নের ওপর মারমুখী হয়ে উঠেছিল, কোনো কোনো স্থানে কুলীন-ব্রাহ্মণদের জোটবাঁধার ফলে এ নাটক শেষ পর্যন্ত অভিনীত হতে পারেনি। যেযুগে নব্যজীবনপ্রবাহ সমাজের শিক্ষিতমহলে ছড়িয়ে পড়ছিল, সমাজের কুসংস্কারের প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়েছিল। তাই ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’র নাট্যালক্ষণ যেমন হোক না কেন, অভিনয়ে এ নাটক বেশ উতরেছিল। তর্করত্নের প্রহসনগুলি কিন্তু কিছু কিছু ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। বহুবিধ নাটক-প্রহসন রচনার জন্য লোকে তাঁকে ‘নাটুকে রামনারায়ণ’ বলত—এই খেতাবেই তিনি পরবর্তিকালে পরিচিত হয়েছেন। মধুসূদনের পূর্বে তিনিই একমাত্র নাট্যকার যিনি অধিকাংশ স্থলে অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই কলম ধরেছিলেন, সমসাময়িক কালে নাট্যকার হিসেবে বেশ খ্যাতিও পেয়েছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের আবির্ভাবের ফলে রামনারায়ণের পুরাতন রীতির নাটকাভিনয় ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেয়ে গেল। তবু এই পুরনো যুগের নাট্যকার অভিনয়কে জনপ্রিয় করবার জন্য কয়েকখানি মঞ্চসফল নাটক-প্রহসন লিখেছিলেন। এ জন্য তিনি এ-দেশের নাটক ও অভিনয়ের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

৪. মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—১৮৭৩)

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের আবির্ভাব আকস্মিক, এবং প্রথম আবির্ভাব কবিরূপে নয়—নাট্যকাররূপে। বাল্যকাল থেকে তিনি ইংরেজি ভাষাটি বেশ ভালোই আয়ত্ত করেছিলেন। কৈশোরে-যৌবনে তিনি ইংরেজের মতোই কবিতা লিখতে পারতেন। চেন্নাই-এ (মাদ্রাজে) থাকার সময় Rizia নামে একখানি ইংরেজি নাটক লিখেছিলেন, কিন্তু ছাপা হয়নি। মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে, বিশেষত বাংলা নাটকের সঙ্গে আকস্মিকভাবে জড়িয়ে পড়লেন। কলকাতায় তখন নাট্যাভিনয় খুব জমে উঠেছে—সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ দিয়ে অভিনয়ের স্বাদ মেটানো হচ্ছে। এই সময় ১৮৫৮ সালে পাইকপাড়ার বিদ্যোৎসাহী জমিদার সিংহদের বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত ‘রত্নাবলী’র অভিনয়ে আমন্ত্রিত হয়ে মধুসূদন বাংলা নাটক সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়লেন এবং নিজেই নাটক রচনার সিদ্ধান্ত করলেন—যদিও তখন তিনি বাংলা ভাষায় কিছুই লেখেননি। যাই হোক, অদম্য উৎসাহ ও অসাধারণ শিল্পবোধের স্বাভাবিক অধিকারের ফলে মধুসূদন অতি অল্পসময়ের মধ্যে মহাভারতীয় ঘটনা অবলম্বনে ‘শর্মিষ্ঠা’ নামে একখানি পৌরাণিক নাটক লিখে ফেললেন। অভিনয়ে এ নাটক প্রথম রজনীতেই অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ১৮৫৯ সালের গোড়ার দিকে ‘শর্মিষ্ঠা’ ছাপা হয়ে বেরুল। খ্রীস্টান মাইকেল মধুসূদন—যিনি এতদিন পাশ্চাত্য সাহিত্যের পুষ্পকাননে বিহার করছিলেন, তিনি যে ভারতের সাহিত্য, বিশেষত মহাভারত সম্বন্ধে এতটা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা কেউ ভাবতেও পারেননি। যাই হোক, এ-দেশে মধুসূদন সর্বপ্রথম নাট্যকাররূপেই আবির্ভূত হন। নাটক রচনা করে যখন তিনি নিজ প্রতিভা ও শক্তি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হলেন, তখন তিনি কাব্য-মহাকাব্যে অবতীর্ণ হলেন। তিন শ্রেণীতে তাঁর নাটক বিভক্ত হতে পারে : ১. পৌরাণিক (‘শর্মিষ্ঠা’—১৮৫৯, ‘পদ্মাবতী’—১৮৬০), ২. ঐতিহাসিক—(‘কৃষ্ণকুমারী’ ১৮৬১), ৩. প্রহসন (‘একেই কি বলে সভ্যতা’—১৮৬০, ‘বুড় শালিকের ঘাড়ে রৌ’—১৮৬০)।

আগেই আমরা বলেছি, ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটকের কাহিনী মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্ভুক্ত—শর্মিষ্ঠা-দেবযানী-যযাতির গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে। মূল আখ্যানের কোনো কোনো চরিত্রকে কবি অধিকতর বিশুদ্ধ চরিত্রাদর্শের দ্বারা নবরূপ দিয়েছেন—যেমন স্বয়ং নায়িকা শর্মিষ্ঠার চরিত্র। তবে বাস্তবতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিক থেকে দেবযানীর চরিত্র অধিকতর জীবন্ত হয়েছে। কাহিনী ও রচনার কোনো কোনো অংশে কালিদাসের শকুন্তলার প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যাবে। কিন্তু এর রচনাক্রম ও গ্রন্থনপদ্ধতি পুরোপুরি পাশ্চাত্যপন্থী। এই নাটক অসাধারণ অভিনয়-সাফল্য অর্জন করেছিল, আর সেইজন্যই এর পরে যত উল্লেখযোগ্য নাটক লেখা হয়েছে, সবকটিতেই পাশ্চাত্য-প্রভাবের অনুসরণ দেখা যায়। বস্তুত ‘শর্মিষ্ঠা’ প্রকাশের পর সংস্কৃতরীতি বাংলা নাটক থেকে প্রায় পুরোপুরি উঠে যায়। অবশ্য ‘শর্মিষ্ঠা’য় আধুনিক নাটকের প্রথম সার্থক সূচনা হলেও এর মধ্যে মধুসূদনের রচনার কিছু কিছু ক্রটি লক্ষ্য করা যাবে। মধুসূদন নাটকে বরাবর পাশ্চাত্য রীতির পক্ষপাতী ছিলেন, কারণ তাঁর মতে যুরোপীয় নাটকে “stern realities of life, lofty passion and heroism of sentiment” আছে। কিন্তু আমাদের সংস্কৃত নাটকে শুধু “all softness, all romance”—তাই তাঁর সুদৃঢ় অভিমত, “Ours are dramatic poem...”। তাঁর এ মত যুক্তিবিরোধী নয়, কিন্তু ‘শর্মিষ্ঠা’য় তিনি ‘softness’ ও ‘romance’-এর বেশি আমদানি করেছেন। এর গতিবেগ আবেগের দ্বারা মগ্ন হয়ে, সংঘাতের চেয়ে বিবৃতি বড়ো হয়েছে, অতিনাটকীয় ও যাত্রার ধরনের বাগাড়ম্বরের ফলে এর নাটকীয় রস বহু স্থলেই উবে গেছে। তিনি সংস্কৃত নাটকের ততটা প্রশংসা না করলেও সেই ধরনের কৃত্রিম লীরিক বাড়াবাড়ির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। একমাত্র দেবযানী ও শুক্রাচার্য ছাড়া আর কোনো চরিত্রেরই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয়নি। প্রথম নাটক রচনায় নাট্যকারের স্বচ্ছন্দ পদচারণা যে বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে তা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় নাটক ‘পদ্মাবতী’ (১৮৬০) এই সমস্ত ক্রটি থেকে অনেকটা মুক্ত হতে পেরেছে। নাটকে ভারতীয় পুরাণের ছদ্মবেশ থাকলেও এটি আসলে ভারতীয় ব্যাপার নয়। গ্রিকপুরাণে প্রসিদ্ধ গল্প ‘Apple of Discord’ অবলম্বনে তিনি ভারতীয় ছাঁচে পাশ্চাত্য গল্পকে খুব সাফল্যের সঙ্গেই ঢেলে নিয়েছেন। এই নাটকে শচী হয়েছেন গ্রিকপুরাণের ইন্দ্রাণী অথাৎ জুনো, মুরলা—প্যালাস, রতি—ভিনাস, ইন্দ্রনীল—প্যারিস ও পদ্মাবতী—হেলেন। চরিত্রগুলোকে মধুসূদন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ভারতীয় ধরনের করে তুলেছেন। এতেও তিনি কিন্তু সংস্কৃত নাটকের প্রভাব ছাড়তে পারেননি। গুরুভার আলংকারিক বাকরীতি ও অন্যান্য মুদ্রাদোষ এখনও রয়ে গেছে—তবে ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিমা ‘শর্মিষ্ঠা’র চেয়ে স্বাভাবিক হয়েছে। এই নাটকে তিনি কলির উজ্জ্বল কয়ছত্র অমিত্রাক্ষর প্রয়োগ করে কাব্যে ছন্দোগত বিপ্লবের সূচনা করেন। এই কমেডি রচনার সময়ে তিনি দু-খানি প্রহসনও (‘একেই কি বলে সভ্যতা’ এবং ‘বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ’) রচনা করে নাট্যসাহিত্যে সব্যসাচীর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

এর পরে ১৮৬১ সালে তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক ‘কৃষ্ণকুমারী’ প্রকাশিত হয়। এর কাহিনী কর্নেল টডের Annals and Antiquities of Rajasthan থেকে গৃহীত হয়েছে—সুতরাং কাহিনীটি মূলত ইতিহাস থেকে নেওয়া—এবং এর পরিণাম হল ট্রাজেডির হাহাকার। ঐতিহাসিক ট্রাজেডি হিসেবে এটি প্রথম নাটক এবং উল্লেখযোগ্যও বটে। এতে রাণা ভীমসিংহের কুমারী কন্যা কৃষ্ণ বা কৃষ্ণকুমারী রাজ্যের কল্যাণে এবং পিতাকে দারুণ বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেন। মানসিংহ ও জয়সিংহ দু’জনেই কৃষ্ণর পাণিপ্রার্থনা করলেন এবং

ব্যর্থ হলে ভীমসিংহের সর্বনাশ করবেন বলে ভয় দেখালেন। ভীমসিংহ কন্যাম্বেহ ও রাজ্যরক্ষা—এর মধ্যে কোনটিকে বেছে নেবেন ঠিক করতে পারলেন না। আত্মহত্যা করে কৃষ্ণ পিতা ও পিতৃরাজ্যকে নিশ্চিত করে গেলেন। এই দুর্ঘটনায় ভীমসিংহ উন্মাদ হয়ে গেলেন। এর সঙ্গে প্রসিদ্ধ গ্রিক নাট্যকার ইউরিপিদেশ প্রণীত ‘ইফিগেনিয়া অ্যাট তৌরিস’ নাটকের কতকটা সাদৃশ্য আছে। উক্ত নাটকে রাজা আগামেম্নন দেবী আর্টেমিসের রোয শান্তির জন্য তাঁর কন্যা ইফিগেনিয়াকে বলি দিয়েছিলেন। এর সঙ্গে রাজ্যের কল্যাণে কৃষ্ণর আত্মহত্যার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। রচনা, গ্রন্থনা, ঘটনা-সংঘাত ও সংলাপের দিক থেকে এ নাটক মাইকেলের নাট্য-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করছে, বাংলা নাটকের ইতিহাসেও এর স্থান খুব উচ্চে। কবি রাণা ভীমসিংহের ট্রাজিক ব্যর্থতা ও কৃষ্ণকুমারীর আখ্যানে করুণরসের উচ্ছ্বাস অতি সংযতভাবে বর্ণনা করেছেন—এর সঙ্গে যে উপকাহিনী আছে, (অর্থাৎ ধনদাস-বিলাসবতীর কাহিনী) তারও প্রয়োগযৌক্তিকতা প্রশংসনীয়। অবশ্য নাটকটি ট্রাজেডি-ঘেঁষা হলেও পুরোপুরি এবং বিশুদ্ধ ট্রাজেডি হতে পারেনি। ভীমসিংহের অতিনটকীয়তা ও কৃষ্ণর করুণরসের লীরিকমূর্ছনা ট্রাজিকধর্মী নাটকে মানায় না। কেউ কেউ বলেন, যে দৃঢ়তা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যর্থতাবোধ থাকলে ট্রাজিক চরিত্র সৃষ্টি হয়, স্ত্রীচরিত্রে তা সম্ভব নয়। অবশ্য অনেক গ্রিক নাটকে নারীচরিত্রকে কেন্দ্র করে ট্রাজেডি লেখা হয়েছিল। সে যাই হোক, কৃষ্ণর নমনীয়তা ও বালিকাসুলভ সরল ভাব তাকে করুণরসের চরিত্রে পরিণত করেছে, ট্রাজিক কঠিনতা দিতে পারেনি। সে যাই হোক, এ নাটকে মধুসূদন গ্রিক অদৃষ্টতত্ত্ব মেনে নিয়েছেন। এই সময় থেকে তিনি জীবনের বেদনাময় গভীর পরিণামের প্রতি আকৃষ্ট হন, এর কিছু পরে লেখা ‘মেঘনাদবধ কাব্য’র মধ্যেও সেই ব্যর্থতার ট্রাজিক হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে। ‘কৃষ্ণকুমারী’ বিশুদ্ধ ট্রাজেডি না হলেও নাটক হিসেবে অনেকটা সার্থক হয়েছে।

মধুসূদন যখন গভীর রসের নাটক লিখছিলেন তখনই আবার রচনার ফাঁকে ফাঁকে দু-খানি প্রহসন লিখে বিচিত্র প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। একখানি হল ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ (১৮৬০), আর একখানির নাম ‘বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ’ (১৮৬০)। পাইকপাড়ার বিদ্যোৎসাহী জমিদার সিংহ-ভ্রাতাদের অনুরোধে মধুসূদন এই দু-খানি প্রহসন রচনা করেছিলেন। প্রথম খানিতে ইংরেজি-শিক্ষিত ভ্রষ্টাচার তরুণ যুবকদের কদাচারকে শাণিত রঙ্গ-ব্যঙ্গের ভাষায় দারুণ কশাঘাত করা হয়েছে, দ্বিতীয় খানিতে তথাকথিত প্রাচীন ব্রাহ্মণ সমাজপতির কুচরিত্র ও লাম্পাট্য খুব রসালভাবে বর্ণিত হয়েছে। ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ পুরোপুরি রঙ্গরসের প্রহসন, কাহিনী নামমাত্র। কিন্তু ‘বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ-তে ক্ষীণভাবে কাহিনীও অনুসৃত হয়েছে। প্রথমটিতে নাগরিক কলকাতার তরুণসমাজ এবং দ্বিতীয়টিতে গ্রাম্য বাংলার ধর্মধ্বজী বৃদ্ধ এর আক্রমণস্থল। তৎকালীন সমাজ, ব্যক্তি, তাদের কদর্য চরিত্র ও নীতিভ্রষ্টতা কবি এমন কৌতুক ও ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, বহুদিন কেউ তাঁকে এ বিষয়ে অতিক্রম করতে পারেননি। সম্প্রতি কোনো কোনো অতি আধুনিক সমালোচক বলতে শুরু করেছেন—মাইকেল বাংলা জানতেন না। এই দু-খানি প্রহসন থেকেই দেখা যাবে মাইকেলের নানা ধরনের বাংলা, মায় উপভাষা—কতটা জানা ছিল, আর জনজীবনের সঙ্গে তিনি কতটা নিবিড়ভাবে পরিচিত ছিলেন। দীনবন্ধুর মতো সত্যকারের নাট্যপ্রতিভাশালী ব্যক্তিও মাইকেলের ‘একেই কি বলে সভ্যতা’র আদর্শে ‘সধবার একাদশী’ লিখেছিলেন। প্রহসন দু-খানি অত্যন্ত জনপ্রিয় হলেও বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে এর অভিনয় হয়নি। কারণ যেখানাই অভিনয় করা যাক না কেন, অপরদল তাতে

দারুণ চটে যেত। সেই মর্মে তারা উদ্যোক্তাদের শাসিয়েছিল। এর জন্য মধুসূদন খুব আঘাত পেয়েছিলেন—রাগ করে তাঁর এক বন্ধুকে তিনি লিখেছিলেন যে, নাটক লিখেও যদি কারও কারও অপছন্দের জন্য তা অভিনীত না হয়, তা হলে, “I shall forswear Bengali and write books in Hebrew and Chinese”। অবশ্য বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনীত না হলেও দেশের নানাস্থানে এর অভিনয় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। গম্ভীররসের নাটকে মাইকেল কতদূর সফল হয়েছেন, সে বিষয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু প্রহসন দু-খানিতে তাঁর যে অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে, তার জন্য বাংলা নাট্যসাহিত্যে তিনি দীর্ঘজীবী হয়ে থাকবেন।

মধুসূদনের নাট্যকলাকৌশল সংলাপের ওপর কতটা নির্ভর করত, তা নিম্নে উদ্ধৃত একটি বেদনাময় উক্তি, এবং আর একটি লঘুতরল সংলাপের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে :

১. ‘কৃষ্ণকুমারী’ (১ম অঙ্ক, ২য় গভাঙ্ক) : ভীমসিংহের উক্তি—

—রজনী দেবী বুঝি এ পামরের গর্হিত কর্ম দেখে, এই প্রচণ্ড কোপ ধারণ করেছেন ; আর চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রভৃতি মণিময় আভরণ পরিত্যাগ করে চামুণ্ডা রূপে গর্জন কচেন। উঃ! কি ভয়ানক ব্যাপার! কি কালস্বরূপ অন্ধকার!... হে কাল, আমাকে গ্রাস কর, হে বজ্র! এ পাপাত্মাকে বিনষ্ট কর, হে নিশাদেবি! এ পাষণ্ডকে পৃথিবীতে আর কেন রাখ! বিনাশ কর।—কৈ এখনও বজ্রাঘাত হলো না? —কৈ বিলম্ব কেন? (হতজ্ঞানে আপন মস্তকে হস্ত দিয়া) এই নেও!— এই নেও! (কিঞ্চিৎ নীরব থাকিয়া) কৈ? বজ্র ভয়ে পলায়ন করলেন নাকি? (বিকট হাসি)

২. ‘বুড় শালিকের ঘাড়ে রৌ’ (২য় অঙ্ক, ২য় গভাঙ্ক)—

স্বাভাবিক বেশে হানিফ গাজীর প্রবেশ

হানিফ : কত্তাবাবু, সালাম করি।

ভক্তপ্রসাদ : (অতি ব্যাকুলভাবে) এ কি! অ্যা! এ আবার কি সর্বনাশ উপস্থিত?

হানিফ : (হাস্যমুখে) কত্তাবাবু, আমি ঘরে আস্যে ফতিরি তল্লাস্ কল্লাম, তা সকলে ক’লে যে সে এই ভাস্ক্য মন্দিরির দিকি পুঁটির সাথে আয়েছে, তাই তারে টুঁড়তি টুঁড়তি আস্যে পড়িছি। আপনার যে মোছলমান হতি সাঁধ গেছে, তা জান্তি পাল্লি ভাবনা কি ছিল? ফতি তো ফতি, ওর চায়েও সোনার চাঁদ আপ্নারে আন্যে দিতি পাত্তাম, তা এর জন্য আপনি এত তজ্দি (পরিশ্রম) নেলেন কেন? তোবা! তোবা!

ভক্তপ্রসাদ : (চিন্তা করিয়া নম্রভাবে) বাবা হানিফ, আমি সব বুঝেছি, তা আমি যেমন তোমার উপর অত্যাচার করেছিলাম, তেমনি তার বিধিমত শাস্তিও পেয়েছি...হে বাবা, তোর হাতে ধরি।

আধুনিক রীতির নাটকের প্রথম পথ নির্মাণ করেন মধুসূদন, তারপর সে পথ ধরে কত নাট্যকার এসেছেন। প্রথম দিকের পেশাদারী রঙ্গমঞ্চগুলো তাঁর এবং দীনবন্ধুর নাটক-প্রহসন নিয়েই আসরে অবতীর্ণ হয়েছিল। মধুসূদনের প্রতিভা মূলত মহাকবি ও গীতিকবির প্রতিভা। তবু নাটকের ক্ষেত্রেও তিনি চমৎকার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা অস্বীকার করা যায় না। হয়তো খুঁটিয়ে দেখলে তাঁর নাটকেও কিছু কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি চোখে পড়বে, কিন্তু নাটকে, বিশেষত প্রহসনে তাঁর লোকচরিত্রজ্ঞান ও তাদের জীবনচিত্রাঙ্কন আজও প্রশংসা দাবি করতে পারে! কবি দুঃখ করে লিখেছিলেন :

অলীক কুনাটা রঙ্গে

মজে লোক রাঢ়েবঙ্গে

নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

রাঢ়বঙ্গের অধিবাসীদের কুনাটা-প্রীতি দূর করে তিনি তাদের যথার্থ নাটকের স্বাদ দিয়েছেন, এর জন্যও তিনি নাটক ও নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে পরম শ্রদ্ধায় অধিষ্ঠিত থাকবেন।

৫. দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০—৭৩)

দীনবন্ধু বাংলা নাটকের করাঙ্গুলিগণনীয় দু-একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের অন্যতম, কারও কারও মতে দুর্বল বাংলা নাটকের তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। মধুসূদন যেমন পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের সূচনা করেন, তেমন দীনবন্ধু বাস্তব জীবনচিত্র-সংবলিত সমসাময়িক সমাজ-জীবনের অতি উজ্জ্বল আলেখ্য রচনা করেছেন। প্রথম জীবনে তিনি কিছুদিন ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য হয়ে রঙ্গরসের কবিতা লিখেছিলেন, পরে সামান্য কিছু কাব্য-কবিতাও লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রধান খ্যাতি নাটকের জন্য।

দীনবন্ধু ডাকবিভাগে কাজ করতেন। সরকারি কর্মে নানাস্থানে যাতায়াত করতে হত, ফলে নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর নাটকে ও প্রহসনে সেই অভিজ্ঞতার বহু বাস্তব পরিচয়ের চিহ্ন রয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গধরনের নিঃস্পৃহ মানুষটি চারিদিকের প্রতি একটি অনুদ্বেজিত অথচ কৌতুকরসসিক্ত মন দিয়ে তাকিয়ে থাকতেন। তাই তাঁর নাটকে নানা ত্রুটি সত্ত্বেও এই প্রসঙ্গতার জন্য উক্ত রচনাগুলি আমাদের অন্তরকে সহজেই আকৃষ্ট করে থাকে।

‘নীলদর্পণ’ (১৮৬০) তাঁর প্রথম নাটক, সর্বাধিক পরিচিত নাটক এবং বাংলা সাহিত্যের একখানি বিশিষ্ট নাটক। এর সঙ্গে নাট্যসাহিত্য, নাট্যমঞ্চ, স্বাদেশিকতা, নীল আন্দোলন, সমাজ-দর্পণ প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। প্রথম নাটকেই তিনি অসাধারণ খ্যাতির অধিকারী হন—যদিও অনেকেই তাঁর নাম জানতেন না, কারণ এই নাটকে তিনি ছদ্মনামের আড়ালে আত্মগোপন করেছিলেন। এই নাটকে বাঙালি কৃষক ও ভদ্রলোকের প্রতি নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচার বর্ণিত হয়েছে। গোপনে গোপনে মধুসূদন এর অনুবাদ করেন।* তাতেও তাঁর নাম ছিল না, শুধু প্রকাশক হিসেবে লঙ সাহেবের নাম ছিল। ফলে লঙ সাহেবের জরিমানা ও কারাবাস হয়। কিন্তু কিছুতেই নীলকরদের জারিজুরি টিকল না, নীলদর্পণের ইংরেজি অনুবাদ The Indigo Planting Mirror পার্লামেন্টে পাঠানো হল, এ-দেশে-বিদেশে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে খুব আন্দোলন হল—ইন্ডিগো কমিশন বসল, আইন করে উক্ত শ্বেতাঙ্গ বর্বরদের ক্ষমতা সংকুচিত হল, কিন্তু এ সবার মূলে হচ্ছে দীনবন্ধুর ‘নীলদর্পণ’ নাটক।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বা তার অনেক আগে থেকে সাহেবরা গ্রামে গ্রামে আড়কাঠি পাঠিয়ে চাষীদের দিয়ে নীল উৎপন্ন করাত, তারপর চড়া দামে সেই নীল রং দেশবিদেশে বিক্রয় করত। তারা নানাপ্রকার বে-আইনি জোর-জুলুমের দ্বারা দাদন দিয়ে কৃষকদের নীল বুনতে বাধ্য করত, কেউ অসম্মত হলে তার সর্বনাশ করে ছাড়ত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে লোকের সহ্যের সীমা অতিক্রম করল; যশোহর, নদিয়া ও চব্বিশ পরগণার কৃষকেরা একজোট হয়ে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে দাঁড়াল, দেশনেতারা বক্তৃতা ও সংবাদপত্রের মারফতে জনমত

* ইদানীং কেউ কেউ এ মতে বিশ্বাস করতে পারছেন না। এই অনুবাদে এমন ভুল-ত্রুটি অসংগতি আছে যে, এটি কৃতবিদ্য মধুসূদনের অনুবাদ না হওয়াই সম্ভব।

গঠনের চেষ্টা করতে লাগল। ব্যাপার বেশিদূর গড়াবার আগেই ইন্ডিগো কমিশন বসিয়ে সাক্ষীসাবুদ নিয়ে দেখা গেল, নীলকর সাহেবরা স্ত্রীঘটিত ব্যাপার ছাড়া (কারণ তা প্রমাণ করা যায়নি) আর সব বিষয়েই শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। নীলকর সাহেবরা এত সহজে দমবার পাত্র নয়, তারাও উকিল-ব্যারিস্টার দিয়ে মামলা লড়ার জন্য তৈরি হতে লাগল। কিন্তু যুদ্ধের সাজসজ্জা সহসা খসে পড়ল। বিজ্ঞানের কৃপায় নীলচাষ বন্ধ হবার উপক্রম হল। জার্মানিতে আবিষ্কৃত অতি সুলভ রাসায়নিক নীল বাজারে এলে এক দিনেই নীলকর-সাহেবদের কুঠি বন্ধ হয়ে গেল। তারা তখন এ-দেশ থেকে পাত্তাড়ি গুটিয়ে আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়ার বিশাল প্রান্তরে চরে খাবার জন্য প্রস্তুত হল—সেখানে গিয়ে নতুন ব্যবসা ফেঁদে বসল। ‘নীলদর্পণ’ের পিছনে সেই সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়ে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্র ‘নীলদর্পণ’কে মার্কিনী মহিলা ঔপন্যাসিক স্টো প্রণীত Uncle Tom’s Cabin (1852)-এর সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন এবং সে তুলনা অতিশয় যুক্তিসংগত। Uncle Tom’s Cabin-এর আদর্শে ‘নীলদর্পণ’ লেখা হতে পারে, কারণ নিগ্রো-দাসত্বের মর্মস্তুদ ঘটনাপূর্ণ স্টো-এর উপন্যাসখানি ‘নীলদর্পণ’ের আট বছর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত উপন্যাসের দ্বারা যেমন আমেরিকার জনমত নিগ্রো-নির্যাতনের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল এবং কালক্রমে সেই নির্মম দাসব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তেমনি ‘নীলদর্পণ’ের (১৮৬০) বাংলা মূল ও ইংরেজি অনুবাদ প্রচারের ফলে শুধু এ-দেশীয়রাই নয়, বিলাতের উদারমতি শ্বেতাঙ্গ-সমাজও নীলকরদের নির্মম অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করে এর প্রতিবিধানের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। আর তাছাড়া বাংলাদেশে ইংরেজ-চরিত্রের প্রতি সর্বপ্রথম সার্বজনীন ঘৃণাবিদ্বেষ সঞ্চারিত হয় এই নাটকাভিনয়ের দ্বারা। স্বাদেশিক গণ-আন্দোলনেরও ভিত্তিভূমি এই নাটক। নীলকর-সাহেবদের কোপে পড়ে গোলোক বসুর সম্পন্ন নিরীহ পরিবার এবং সাধুচরণ নামে এক বিশিষ্ট ভদ্র রায়তের বংশ কীভাবে ধ্বংস হল, উক্ত শ্বেতাঙ্গ বর্বরেরা নিরীহ গ্রামবাসীর অসহায়তা এবং বিচারবিভাগের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতার সুযোগে কীভাবে পশুবৎ আচরণ করত, এমনকি গর্ভিণী রমণীও তাদের পশুদৃষ্টির ঘৃণ্য ক্ষুধা থেকে বাঁচতে পারত না—তারই অতি কঠোর ও বাস্তবচিত্র এঁকে দীনবন্ধু বাংলা নাটকের নতুন পথ খুলে দেন, বাংলার স্বাদেশিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, গ্রাম্য নরনারীর দুঃখদুর্ভর ও নির্যাতন-পীড়িত অসহায় অবস্থার প্রত্যক্ষ চিত্র অঙ্কন করেন এবং বাক্রীতি ও সংলাপে বিভিন্ন চরিত্রের উপযোগী পরিপূর্ণ বাস্তব-জীবনের ভাষা ব্যবহার করে বাংলা নাট্যকারদের মধ্যমণি বলে স্বীকৃতি লাভ করেন। অবশ্য ‘নীলদর্পণ’ নাটক ট্র্যাজেডি হিসেবে খুব সার্থক হয়নি। এতে তিনি জনসাধারণ ও দুষ্ট চরিত্রাঙ্কনে অসাধারণ বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় দিলেও তথাকথিত সং ও সাধু-প্রকৃতির ভদ্র চরিত্র অঙ্কনে ততটা সার্থক হননি—এঁদের ব্যবহার, ভাষা ইত্যাদি অত্যন্ত কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। তাছাড়া ট্র্যাজেডির সূক্ষ্মতা, বেদনার তীব্রতা প্রভৃতির চেয়ে খুনোখুনি, আত্মহত্যা প্রভৃতি স্প্যানিশ ট্র্যাজেডির মতো রক্তারক্তির বাহ্যিক আড়ম্বরটাই এ নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। স্পেনদেশের জাতীয় চরিত্র ট্র্যাজেডি বলতে রঙ্গক্ষেত্রে খুনোখুনির বাস্তব অনুকরণকেই বেশি পছন্দ করত। দীনবন্ধুর সৃষ্টি-প্রতিভা কতকটা শেক্সপীয়রের সঙ্গে তুলনীয় হলেও ‘নীলদর্পণে’ তিনি সে ট্র্যাজিক সংযম ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারেননি—তাছাড়া গ্রন্থনৈপুণ্যও তাঁর প্রথম নাটকে তেমন দানা বাঁধতে পারেনি—অনেক স্থলে অনাবশ্যক ব্যাপার নিয়ে বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করেছেন। তবু সুকঠোর বাস্তবচিত্র, জনচরিত্রের সঙ্গে নাট্যকারের সহানুভূতি, সহজ কৌতুকরস এবং সমসাময়িক উত্তেজক পরিবেশের জন্য নানা ক্রটিপূর্ণ হয়েছে

‘নীলদর্পণ’ সেযুগে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, এখনও মাঝে মাঝে শৌখীন সম্প্রদায় এই নাটক অভিনয় করে দীনবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকেন। এখানে নীলদর্পণ থেকে সাহেবদেব গুদামঘরে রুদ্ধ অসহায় রায়তদের কিছু সংলাপ উদ্ধৃত হচ্ছে (২য় অঙ্ক, ১ম গভাঁঙ্ক) :

বেগুনবেড়ের কুটির গুদামঘর

তোরাপ, ও আর রাইয়ত উপবিষ্ট

তোরাপ : ম্যারে ক্যান ফ্যালায় না, মুই নেমোখারামি কন্তি পারবো না—ঝে বড়বাবুর জনি জাত বাঁচেচে, ঝার হিল্লৈয় বস্তি কন্তি নেগিচি, ঝে বড়বাবু হাল গোরু বেঁচেয়ে নে বেড়াচে, মিত্যে সাক্ষী দিয়ে সেই বড়বাবুর বাপকে কয়েদ করে দেব? মুই তো কখনুই পারবো না—জান্ কবুল।

প্রথম রাইয়ত : কুঁদির মুখি বাঁক থাকবে না, শ্যামচাঁদের ঠালা বড় ঠালা। মোদের চকি কি আর চামড়া নেই, না মোরা বড়বাবুর নুন খাইনি—তা কি করবো কি, সাক্ষী না দিলি যে আস্ত রাখে না—উট সাহেব মোর বুকি দেঁড়য়ে উটেলো—দ্যাদিনি, অ্যাকন তবাদি অঙ্ক ঝোঝানি দিয়ে পড়্চে—গোডার পা য্যান বল্দে গোরুর খুর!

দ্বিতীয় : প্যারেকের খোঁচা—সাহেবেরা যে প্যারেক মারা জুতো পরে জানিস্ নে?

তোরাপ : (দস্ত কিড়িমিড়ি করিয়া) দুস্তোর প্যারেকের...। লৌ দেখে গাডা মোর ঝাঁকি মেরে ওট্চে। উঃ কি বল্‌বো, সমিন্দিরে অ্যাকবার ভাতারমারির মাটে পাই, এম্নি থাপ্পোড় ঝাঁকি, সমিন্দির চাবালিডে আসমানে উড়্য়ে দেই, ওর গ্যাডম্যাড করা হের ভেতর দে বার করি।

এই গ্রাম্য যশুরে ভাষার মধ্য দিয়ে দীনবন্ধু আশ্চর্য কৌশলে রায়তদের চরিত্রগুলির অন্তর্নিহিত ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন।

দীনবন্ধুর প্রতিভা মূলত শ্রেষ্ঠ কমেডি-লেখকের প্রতিভা। উচ্চশ্রেণীর নাট্যধর্মময় কৌতুক ও পরিহাস, জীবনের ক্ষয়ক্ষতির প্রতি নিঃস্পৃহতা, নানা অসংগতির প্রতি প্রথমশ্রেণীর হাস্যরসিকের মতো সকৌতুক সহনশীলতা—এর দ্বারা তিনি বাংলা নাটকে স্পৃহণীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু যেখানে রোমান্টিক নায়ক-নায়িকার চরিত্র নিয়ে প্রেমের গল্প ফেঁদেছেন সেখানে তা প্রাণহীন কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। ‘নবীন তপস্বিনী’ (১৮৬৩) এবং ‘কমলে কামিনী’ (১৮৭৩) এই ধরনের কমেডি বা মিলনে সমাপ্ত নাটক। এতে যে পাশ্চাত্যচরিত্রগুলি বর্ণিত হয়েছে, তাদের সরস কৌতুকপ্রবণ রূপায়ণ দীনবন্ধুর স্বাভাবিক ক্ষমতাকেই সুপ্রমাণিত করেছে। ‘নবীন তপস্বিনী’র (১৮৬০) জলধর চরিত্র শেক্সপীয়রের Merry Wives of Windsor-এর ফলস্টাফের অনুকরণে অঙ্কিত হলেও এর ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ও কৌতুকরস দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যাই হোক, বাস্তবজীবনের উজ্জ্বল চিত্রপট ও তার আলো-আঁধারের লীলা তাঁকে এমন আকৃষ্ট করেছিল যে, তিনি রোমান্সের জগতে স্বপ্নপ্রয়াণে ততটা সার্থক হননি।

‘নীলদর্পণ’ের পর তাঁর খ্যাতি কয়েকখানি প্রহসন ও প্রহসনধর্মী নাটকের ওপর নির্ভর করছে—যাতে তাঁর প্রতিভা আত্মপ্রকাশের যথার্থ পথ পেয়েছে। ‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’ (১৮৬৬) প্রহসনে বিবাহবাতিকগ্ৰস্ত এক বৃদ্ধের নকল বিয়ের আয়োজন করে স্কুলের অকালপরিপক্ব ছেলেরা কী ভাবে তাঁকে নাস্তানাবুদ করেছিল তারই এক কৌতুককর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

তবে এর কাহিনী ও চরিত্র নিতান্তই সাধারণ স্তরের। ‘জামাই বারিকে’ (১৮৭২) ধনি-পরিবারের ঘরজামাই পোষার প্রথাকে হাসিঠাট্টার মধ্য দিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে—শোনা যায় এর লক্ষ্য কলকাতার কোনো প্রসিদ্ধ অভিজাত পরিবার। ‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’র ঘটনা নামমাত্র, চরিত্রও সুচিত্রিত হয়নি, কিন্তু ‘জামাই বারিকে’ প্রধান ও অপ্রধান দুটো কাহিনীই সুগ্রহিত হয়েছে, এবং হাস্যপরিহাস ও কৌতুকরসে চরিত্রগুলো অতিশয় জীবন্ত রূপ ধরেছে। জামাই বাবাজীদের মর্কটলীলা, বগী-বিন্দী দুই সতীনের ‘হাড়াই-ডোমাই’ ঝগড়া, দু’ সতীনের জ্বালায় পদ্মালোচনের বিড়ম্বনা ইত্যাদির রসিকতা বাংলাদেশে প্রায় ক্লাসিক পর্যায়ে উঠে গেছে। এতে তিনি যে কৌতুকরস ও কমেডির আয়োজন করেছেন, এখনও তার অভিনয় অতিশয় চিত্তাকর্ষক মনে হয়। তাঁর ‘লীলাবতী’ (১৮৬৭) সমসাময়িক নাগরিক জীবনের হাস্যপরিহাস ও নায়ক-নায়িকার মিলন-সংক্রান্ত একটা জটিল কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে। নায়ক ললিত এবং নায়িকা লীলাবতীর প্রণয় ও বিবাহ এর মূল ঘটনা হলেও কয়েকটা রংদার মর্কট শ্রেণীর চরিত্র এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিশেষত নদেরচাঁদের চরিত্র কৌতুকচরিত্র হিসেবে এখনও অতুলনীয়। ‘লীলাবতী’র বড়ো আকর্ষণ নায়ক-নায়িকা নয়। তাদের কৃত্রিম প্রণয় ততোধিক কৃত্রিম পয়ারে প্রেম নিবেদন ও কবিত্বপ্রকাশ প্রায় অসহনীয় মনে হয়। দীনবন্ধু—কেন জানি না ভদ্র, রোমান্টিক, প্রেমিক-প্রেমিকার চরিত্র আঁকতে গেলেই জবুথবু হয়ে পড়তেন। তাদের ভাষা, জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার তিনি যেন পরীস্থান থেকে আমদানি করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, যে, রোমান্টিক ব্যাপার এবং আধুনিক নায়ক-নায়িকার প্রেম-প্রণয় সম্বন্ধে তাঁর কোনো রকম অভিজ্ঞতা ছিল না, সে যুগে ঠিক এজাতীয় নায়িকাচরিত্র বাস্তবে বড়ো একটা মিলতও না। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে লীলাবতীর মতো “হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে, কোর্টশিপের পাত্রী হইয়া, যিনি কোর্ট করিতেছেন, তাঁহাকে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে, এমন মেয়ে বাঙালী সমাজে ছিল না।” এ আদর্শ দীনবন্ধু ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটক থেকে নিয়েছিলেন এবং এগুলি বাস্তব ছিল না বলে কিছু অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছে।

তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব একখানি প্রহসনধর্মী নাটকেই ধরা পড়েছে। সেখানি হল ‘সধবার একাদশী’ (১৮৬৬)। এতে সেযুগের কলকাতার উচ্চশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের পানাসক্তি, লাম্পট্য, পরস্প্রীহরণ প্রভৃতি চরিত্রভ্রষ্টতার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বলাই বাহুল্য, এ নাটক মধুসূদনের ‘একেই কি বলে সভ্যতা’র আদর্শে রচিত। মাইকেলের প্রহসনটি যথার্থ প্রহসন, চরিত্র বা ঘটনার বিশেষ কোনো বিকাশ নেই। কিন্তু দীনবন্ধুর ‘সধবার একাদশী’ প্রহসন হলেও পুরোপুরি নাটকের রীতিতে রচিত। মূল চরিত্র নিমচাঁদ দত্তের সুখদুঃখ, মাতলামির ঝোঁকে হাস্যকর উক্তি ও আচরণ অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। নিমো দত্ত সেযুগের প্রতীকচরিত্র। উচ্চশিক্ষিত ও আদর্শবাদী হয়েও সংযমের অভাবে সে মদের স্রোতে ভেসে গেছে। কিন্তু সে চরিত্রহীন লাম্পট নয়, অন্যান্য বদ দোষ তার চরিত্রে নেই। ইংরেজি শিক্ষার সুরাপানে সে বেসামাল হয়ে পড়লেও শিক্ষা ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে মাতলামির ঝোঁকেও সর্বদা আত্মসচেতন। কিন্তু সেই ইংরেজি বিদ্যার কল্যাণের দিকটি সে কাজে লাগাতে পারেনি—তার জীবন পানাসক্তির দোষে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে। তার সেই হতাশা, পরাভূত চরিত্রের আত্মগ্লানি ও মনোবেদনা হাস্য-পরিহাসমুখর ভাষা ও আচরণের মধ্যে মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছে। আমাদের তো মনে হয়, তার পরিহাস, ভাঁড়ামি, রঙ্গব্যঙ্গ—আসলে এর দ্বারা সে নিজের ব্যর্থ জীবনের কান্নাকেই চাপা দিতে চেয়েছে, কিন্তু মুখের হাসিতে চোখের জল

ঢাকা পড়েনি। তার উতরোল হাস্য-পরিহাসের পিছন দিকে যেন অশ্রুনিরুদ্ধ ভগ্নস্বর ক্ষীণসুরে বাজতে থাকে। এ প্রহসন নাটক হয়ে উঠেছে, এর চরিত্র ‘ক্যারিকেচর’ ছাড়িয়ে যথার্থ নাটকীয় চরিত্র হয়েছে। ‘সধবার একাদশী’ বাংলার দুর্বল নাট্যসাহিত্যের একটি সবল সজীব সংযোজন, এতে তিনি শেক্সপীয়রীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে আধুনিক ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যের মুকুটমণি হবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। অবশ্য এই নাটকে, এবং অন্যত্র তিনি কোনো কোনো সময়ে একটু স্থূল ও কুরুচিপূর্ণ হাস্য-পরিহাসের আমদানি করেছেন। ‘নীলদর্পণ’ ও ‘সধবার একাদশী’র কোনো কোনো অংশ আধুনিক দর্শকের কাছে কিছু আপত্তিকর মনে হতে পারে। কিন্তু এজন্য নাট্যকারকে দোষ দেওয়া উচিত নয়। নাটকে পাত্র-পাত্রীর যথাযথ স্বরূপ ফোটাতে গেলে ভদ্রভাব্য রুচির দিকে তাকালে চলে না। ‘নীলদর্পণ’ের তোরাপ ও আদুরী, ‘সধবার একাদশী’র নিমে দত্তের কথাবার্তা আধুনিক শ্রোতার কাছে বড়ো বেশি গ্রাম্য, বর্বর ও কুরুচিপূর্ণ মনে হতে পারে। শেক্সপীয়রের ইয়্যাগো এবং ফলস্টাফও কি খুব মাপাজোখা ভাষায় কথা বলত? বঙ্কিমচন্দ্রের এ মন্তব্য খুবই যুক্তিসংগত যে, দীনবন্ধু “তোরাপের সৃষ্টিকালে তোরাপ যে ভাষায় রাগ প্রকাশ করে, তাহা বাদ দিতে পারিতেন না, নিমচাঁদ গড়িবার সময়ে নিমচাঁদ যে-ভাষায় মাতলামি করে তাহা ছাড়িতে পারিতেন না। রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।” এখানে এই ধরনের কিছু সংলাপ (‘সধবার একাদশী’, শেষ দৃশ্য) উদ্ধৃত হচ্ছে :

নিমচাঁদ : অটল, তোমার মাগ তুমি নিয়ে এলে বাবা, এখন আমার ঘাড়ে ফেলে দিচ্চো—
রামবাবু, আমি কিছুই জানিনে মহাশয়। আমি কি এমন কাজ কত্তে পারি?

রামবাবু : তবে কে করেছে?

নিমচাঁদ : সময়। সভ্যতার সঙ্গে বিদ্যাভাবের উদ্বাহ হলেই বিড়ম্বনার জন্ম হয়। রামবাবু,
চেপে যাও বাবা, Let bygones be bygones...

রামবাবু : আমি অবাক হইচি, ব্যাটাদ্বের অসাধ্য ক্রিয়া নাই।

নিমচাঁদ : রামবাবু, বড় বাধিত হলেম্ বাবা—

রামবাবু : তুমি বসো, আমি তোমার শ্রাদ্ধের আয়োজন করে আস্চি।

নিমচাঁদ : ব্রাহ্ম মতে কত্তে হবে ; অনেক বৃষ পার করিচি, এখন আর বৃষ উৎসর্গ ভালো লাগবে না।

রামবাবু : সে ব্যবস্থা পুলিশে লওয়া যাবে।

নিমচাঁদ : এইবার ফুলিসের মতো কথা বল্যেন। কুলের কুচ্ছ ব্যক্ত করা কাপুরুষের কাজ—
একটু সূত্র পেলে যা কখনো ঘটেনি তা রট্য়ে দেবে। আমি শপথ করে বলতে পারি, তোমাদের কুলের কোনো কামিনীকে আমি কখনো দেখিনি, কিন্তু তুমি যদি নালিস কর, আমি বাড়ীর ভিতর গিয়েছিলাম, লোকে বলবে, ওদের বাড়ীর ছেলেগুলো সব নিমের মতো—I refer you to Shridan's School for Scandal.

দীনবন্ধুর নাট্যসৃষ্টি অবিকল শেক্সপীয়রের মতো—অবশ্য সংকীর্ণতর ক্ষেত্রে। সেই বিশুদ্ধ বস্তুগত দৃষ্টি, জীবনের প্রতি প্রসন্নতা, পরিহাস ও বেদনা, ব্যঙ্গ ও করুণার এমন সমাবেশ আমরা আর কোনো বাঙালি নাট্যকারের মধ্যে পাইনি। ম্যাথু আরনল্ড কীটসের কবিত্বপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, “He is with Shakespeare.”—সেই কথার প্রতিধ্বনি করে দীনবন্ধু সম্বন্ধেও

আমরা বলতে পারি, “He is with Shakespear”। শুধু শেক্সপীয়রের ট্রাজিক বোধ তাঁর ছিল না, জীবনরঙ্গমঞ্চের পর্দা তুলে দেখবারও তাঁর ইচ্ছে হয়নি। যদি তিনি শেক্সপীয়রের মতো জীবনসমুদ্রের তলদেশে দৃষ্টিপাত করবার মতো প্রতিভার অধিকারী হতেন তা হলে তাঁকে আমরা অবলীলাক্রমে শেক্সপীয়রগোষ্ঠীর পুরোভাগে স্থান দিতাম। সে যাই হোক, বাংলার নাট্যমঞ্চের ক্রমবিকাশে তাঁর নাটকগুলির দাম কম নয়। তাঁর ‘নীলদর্পণ’, ‘জামাই বারিক’, ‘সধবার একাদশী’, ‘লীলাবতী’ নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম-অষ্টম দশকের শৌখীন ও পেশাদার অভিনেতৃ-সম্প্রদায় প্রথম রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হন, তাঁর নাটকগুলিকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশে নাট্যাভিনয় খুব জমে উঠেছিল। গিরিশচন্দ্রের মতো অভিনেতা, প্রযোজক ও শিক্ষক ও দীনবন্ধুর মতো নাট্যকার ছিলেন বলেই বাংলাদেশের শহর ও শহরতলিতে এত শীঘ্র নাট্যাভিনয় সংস্কৃতির বাহন হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল।

কোনো কোনো দিক দিয়ে দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের ভাবশিষ্য ছিলেন, কৈশোরকালে ‘সংবাদপ্রভাকরে’ তিনি অনেক গদ্য-পদ্য লিখেছিলেন, অবশ্য তাতে বিশেষ কোনো প্রতিভার চিহ্ন ছিল না। পরবর্তিকালে তিনি ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাবে গদ্য-পদ্য রচনার ধারা রক্ষা করেছিলেন। তাঁর ‘সুরধুনী কাব্য’* (১৮৭১, ১৮৭৬) ‘দ্বাদশ কবিতা’ (১৮৭২) নামে কবিতাগুচ্ছ এবং ‘যমালয়ে জীবন্ত মানুষ’ ও ‘পোড়ামহেশ্বর’ শীর্ষক গদ্য স্কেচ দুটি এমন কোনো প্রতিভাদ্যোতক নয়—অবশ্য ‘যমালয়ে জীবন্ত মানুষে’ তাঁর পরিহাসপ্রিয়তা অটুট আছে। তবে এসব রচনার জন্য তাঁর খ্যাতি নয়, নাট্যকার হিসেবেই তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যে চিরদিন বেঁচে থাকবেন। মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে তাঁর অকালে মৃত্যু হয়, তিনি আর একটু দীর্ঘজীবী হলে বাংলা নাটকের কত যে উন্নতি হত, তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

গিরিশচন্দ্র অভিনেতাদের গুরু, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা, সেযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা, এবং বাংলা নাটকের অতি বিখ্যাত রচনাকার। কেউ কেউ তাঁকে ইংলন্ডের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা গ্যারিকের সঙ্গে তুলনা দিয়ে থাকেন। কিন্তু গ্যারিক শুধু অভিনেতা ছিলেন, এবং দু-একখানি অতি বাজে নাটক লিখেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের মতো একাধারে নট-নাট্যকার-নাট্যপরিচালক পৃথিবীর নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে খুব কমই দেখা গেছে। কেউ কেউ আবার ভক্তির আবেগে তাঁকে শেক্সপীয়রের পাশে, কেউ-বা তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে শেক্সপীয়রের মাথার ওপরে তাঁকে বসাতে চান। এসব অতি ভক্তির বাড়াবাড়ি হাস্যকর। শেক্সপীয়রের প্রতিভা তাঁর আদৌ ছিল না, পরবর্তিকালে পৃথিবীর কোন্ নাট্যকারই-বা সর্বাংশে শেক্সপীয়রের সমতুল্য? এসব অলংকৃত অযৌক্তিক বিশেষণ ছেড়ে দিলেও বাংলা নাট্যসাহিত্যের ও অভিনয়ের গিরিশচন্দ্র যে প্রতীক-পুরুষ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর চেষ্টাতেই বাংলা নাটক সর্বপ্রথম পেশাদারী ব্যাপারে পরিণত হয়, তিনিই সর্বপ্রথম নাট্যাভিনয়কে একটি সুচারু শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন, চরিত্রাভিনয়ে তিনি একটি বিশিষ্ট রীতির প্রবর্তন করেন, নাট্যাভিনয়-শিক্ষক হিসেবে নতুন 'স্কুল' প্রতিষ্ঠিত করেন, যেখানে অশিক্ষিতা পণ্যারমণীকেও অসামান্য অভিনেত্রীতে পরিণত করা সম্ভব হয়েছিল। সর্বোপরি তাঁর নেতৃত্বেই ১৮৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে ন্যাশনাল থিয়েটার নামে সর্বপ্রথম পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হয় (অবশ্য গোড়ার দিকে মতবিরোধের ফলে তিনি এর থেকে কিছুকাল দূরে সরে ছিলেন), যেখানে সাধারণে দর্শনীর বিনিময়ে নিয়মিত অভিনয় দেখবার সুযোগ পেল। এর আগে ধনী ব্যক্তির বদান্যতার ওপর অভিনয় নির্ভর করত, এবং সেখানে সাধারণের বড়ো একটা প্রবেশাধিকার ছিল না। তাই মনে হয়, গিরিশচন্দ্র না এলে আজ বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের যে বিকাশ দেখতে পাচ্ছি, হয়তো তার এতটা শ্রীবৃদ্ধি হত না।

প্রথম জীবনে অভিনয়-পাগল গিরিশচন্দ্রের অভিনেতা রূপেই আবির্ভাব হয়েছিল। নিজে ছিলেন সু-অভিনেতা, এবং বিচক্ষণ শিক্ষার গুণে একদল অনুরাগী অভিনেতার সৃষ্টিও তাঁর অন্যতম কৃতিত্বের পরিচায়ক। ক্রমে ক্রমে তিনি মাইকেল-দীনবন্ধু ও অন্যান্য ছোটো-বড়ো নাট্যকারের সব নাটক অভিনয় করে পুরোনো করে ফেললেন, অনেক কাব্য-উপন্যাসকেও নাট্যকাারে অভিনয় করলেন, যেমন—মেঘনাদবধ কাব্য, পলাশির যুদ্ধ, বঙ্কিম-রমেশের উপন্যাস। কিন্তু সব অভিনয়ই পুরাতন হয়ে গেল, নতুন নাটক না হলে দর্শকের মনস্তৃষ্টি হয় না। তখন অভিনেতা গিরিশচন্দ্র নিজেই নাটক লিখতে আরম্ভ করলেন। একাধারে তিনি নট ও নাট্যকারের দুর্লভ প্রতিভার সমন্বয় দেখালেন। শেক্সপীয়র নাটক অভিনয়ে ভূমিকা নিলেও সু-অভিনেতা ছিলেন বলে শোনা যায় না। গ্যারিক সু-অভিনেতা হলেও দু-একখানি প্রহসন ভিন্ন কিছুই লেখেননি। এদিকে থেকে গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা অনন্যসাধারণ।

গিরিশচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ, প্রহসন, 'পঞ্চরং', রূপক, গীতিনাট্য প্রভৃতির সংখ্যাও অনুরূপ। অভিনয়, নাট্যালয়, অভিনয়-শিক্ষা প্রভৃতি নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থেকেও তিনি যে কী করে শতাধিক নাটক লিখলেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। অবশ্য একথা ঠিক যে অসংখ্য নাটক-নাটিকা লিখলেও এর অনেকগুলিই শুধু দর্শকদের চাহিদা মেটাবার জন্য রাতারাতি লেখা হয়েছিল, নাট্যকার এর নাট্যলক্ষণ বা সাহিত্যগুণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেননি। এমনকি, কিছু অপ্রিয় হলেও বলা যায়, এই শতাধিক নাটকের ক'খানি শতবর্ষ পরে বাঁচবে তাতে গভীর সন্দেহ আছে। কেউ কেউ সুলভ আবেগ ও যুক্তিহীন ভাবুকতার বশে

বলেছেন, “মৃত্যুর একশত বৎসর পরে ইংলণ্ডে যেমন শেক্সপীয়ারের আদর হইয়াছিল—
তেমনি একদিন আসিবে—যেদিন এ-দেশ গিরিশচন্দ্রকে চিনিবে, তাঁহাকে আদর করিবে, তাঁহার
গুণকীর্তনে গর্ব অনুভব করিয়া ধন্য হইবে। তাঁহার গান, তাঁর নাটক যাচাই করিবার জন্য
সাগর পাড়ি দিতে হইবে না ; পশ্চিম হইতে বিদেশীয় শিক্ষার্থী আসিয়া নতজানু হইয়া শিখিয়া
যাইবে—গিরিশ-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য, গিরিশ-সাহিত্যের রসমাধুর্য” (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন)। এসব
অতিভক্তির ভাবাবেগরুদ্ধ স্তুতিবাদ নিশ্চয়ই সাহিত্যবিচারের উচ্চ আদর্শ নয়।

প্রথম দিকে গিরিশচন্দ্র কয়েকখানি গীতিকাব্য (‘আগমনী’—১৮৭৭, ‘অকালবোধন’—
১৮৭৭, ‘দ্বাদলীলা’, ‘মৌহিনীপ্রতিমা’) রচনা ও অভিনয় করে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছিলেন,
কিন্তু উপযুক্ত নাট্যগুণ ও সাহিত্যরসের অভাবের জন্য এগুলির কোনোখানিই পরবর্তিকালে
অভিনীত হয়নি। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব হচ্ছে ভক্তিরসের পৌরাণিক নাটক। তাঁর আগে মনোমোহন
ও রাজকৃষ্ণ পৌরাণিক নাটকে কিছু গৌরব অর্জন করেছিলেন বটে, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক
নাটকগুলি অধিকতর উৎকৃষ্ট হয়েছিল বলে অন্য সকলের যশ আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।
‘অভিমন্যুবধ’ (১৮৮১), ‘জনা’ (১৮৯৪), ‘পাণ্ডবগৌরব’ (১৯০০) একদা অত্যন্ত সাফল্যের
সঙ্গে বাংলা ও বাংলার বাইরে অভিনীত হয়েছে। এখনও ‘জনা’ নাটকের জনপ্রিয়তা হ্রাস
পায়নি। ‘জনা’য় জনার মাতৃহৃদয় ও বীরনারীর অদ্ভুত চরিত্রাঙ্কনে তিনি খুবই সাফল্য লাভ
করেছিলেন। পুত্রশোকাতুরা প্রায়-উন্মাদিনীর এই বিলাপোক্তি অত্যন্ত আন্তরিক হয়েছে, তাতে
সন্দেহ নেই :

দূরে—দূরে—ভীষণ প্রান্তরে—

মরুভূমে—দুরন্ত শ্মশানে—

হেথা তোর নাহি স্থান!

দুর্গম কান্তারে, তুষার-মাঝারে,

পর্বতশিখরে চল্।

চল্ পাপ রাজ্য ত্যজি,

পতি তোর পুত্রঘাতী অরাতির সখা।

চল্ পুত্রশোকাতুরা—

চল্ বালুময় বেলায় বসিয়ে

দেখিবি বাড়বানল।

চল্ যথা আগ্নেয় ভূধর,

নিরন্তর গভীর হংকারে

উগারে অনলরাশি।

চল্ যথা বাসুকির শ্বাসে

দধক দিক্দিগন্তর।

চল্ যথা ঘোর তমোমাঝে,

খেলে নীল প্রলয়-অনল

লকলকি বিশ্বগ্রাসী জিহ্বা।

দূরে—দূরে—

হেথা তোর নাহি স্থান, পুত্রশোকাতুরা।

(জনা, ৪র্থ অঙ্ক, ৫ম গর্ভাঙ্ক)

তিনি অন্যান্য পৌরাণিক নাটকে হিন্দু পুরাণ-সংস্কৃতির ঐতিহ্যগুলিকে পুনরায় লোকসমাজে প্রচার করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। এই সময়টা চলছিল বঙ্কিম-প্রভাবের যুগ, যাকে বলে Hindu-revival-এর কাল। এর আগে ব্রাহ্ম-সমাজের নানা দল-উপদল পৌরাণিক হিন্দু সংস্কৃতিকে নস্যাৎ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর শিষ্যসম্প্রদায় পৌরাণিক সংস্কৃতিকে যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা নতুন করে বিচার আরম্ভ করেন। ফলে শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই পৌরাণিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি কৌতূহলী হয়ে পড়েন। ঠিক এই সময়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব হয়। তাঁদের প্রভাবে হিন্দু-সংস্কৃতির পূর্বাপর যোগসূত্রটি (অর্থাৎ বৈদিক ও পৌরাণিক ঐতিহ্য) সকলেরই চিত্তে আশা ও প্রশান্তি এনে দিল। গিরিশচন্দ্র প্রথম জীবনে কিছু স্বেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল হলেও ক্রমে ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপা লাভ করলেন, বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বন্ধুত্ব পেলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের মধ্যে ঠাই পেয়ে বেপরোয়া জীবনকে সংযত করলেন, ঠাকুরের প্রতি অচলাভক্তি তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। অবশ্য তাঁর অনিয়ন্ত্রিত জীবন যথার্থত নিয়মের মধ্যে কোনও দিনই আসতে পারেনি। তবু ‘ভক্তভৈরব’ গিরিশের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব এক বিচিত্র অধ্যায়, আর সেই মনোভাবের স্পর্শ পাওয়া যাবে তাঁর পৌরাণিক ও ভক্তিরসের নাটক-নাটিকায়। এ দিক দিয়ে তাঁর ‘চৈতন্যলীলা’ (১৮৮৪) ও ‘বিষ্ণুমঙ্গল’ (১৮৮৮) আদর্শ ভক্তিরসের নাটক। ভারতীয় পুরাণের প্রধান প্রধান নৈতিক আদর্শ, ভক্তি-নিষ্ঠা প্রভৃতি তত্ত্বগুলিকে তিনি অতি দক্ষতার সঙ্গে পৌরাণিক ও ভক্তিরসের নাটকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

অবশ্য সূক্ষ্মদৃষ্টির সমালোচক হয়তো বলবেন, পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয়ের কথা ঘোষণা করতে গিয়ে গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটককে যথার্থ নাটক করতে পারেননি। সমসাময়িক দর্শকসমাজের দিকে চেয়ে তিনি নাটক লিখেছিলেন বলে আধুনিক কালে এ সমস্ত নাটকের সুলভ ভক্তিরস ও করুণরসের বাড়াবাড়ি, এবং স্থূল ধরনের হাস্য-পরিহাস অনেকেরই রুচিকর হবে না। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা পাবার পর যাত্রাধরনের পৌরাণিক ও ভক্তির নাটকে তাঁর অকপট হৃদয় এমনভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, এর নাট্যলক্ষণ যাই হোক না কেন, নাট্যকারের বিশ্বাস ও নিষ্ঠার প্রশংসা করতেই হবে। এযুগের বাঙালি-ঐতিহ্যের পরিচয় পেতে হলে তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলিতেই তার অনেক সূত্র মিলবে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ‘বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে’র পটভূমিকায় গোটা বাংলাদেশে যে সাড়া পড়ে গিয়েছিল, কবি, সাহিত্যিক ও নাট্যকারের দল তাতে যোগ না দিয়ে পারেননি। গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকের কারবারী হলেও সমসাময়িক রাজনৈতিক ও স্বাদেশিক উত্তাপের আঁচ পেয়েছিলেন। সেই স্বাদেশিক অনুরাগ তাঁর কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটকে ফুটে উঠেছে। সিরাজদ্দৌলা (১৯০৬), ‘মীরকাশিম’ (১৯০৬), ‘ছত্রপতি শিবাজী’ (১৯০৭), ‘অশোক’ (১৩৯১), ‘সৎনাম’ (১৯০৪)—এই সমস্ত ঐতিহাসিক বা ছদ্ম-ঐতিহাসিক নাটকে গিরিশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম ও ঐতিহাসিক বোধ লক্ষ্য করা যাবে। অবশ্য তিনি ইতিহাসের একনিষ্ঠ পাঠক হয়েও ইতিহাসের ঘটনাকে নিপুণভাবে অনুসরণ করেননি। ‘সিরাজদ্দৌলা’ ‘মীরকাশিম’ের আখ্যানভাগ গ্রহণে মৌলিক উৎসের সন্ধান না নিয়ে তিনি শুধু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের দু-খানি গ্রন্থকে একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ জ্ঞান করেছিলেন। অকারণে স্বাদেশিক উচ্ছ্বাস, স্থান-কাল-পাত্রের অনৈতিহাসিকতা, অতি-নাটকীয়তা, বাস্তববোধের অভাব—ইত্যাদির ফলে তাঁর

নাটক যথার্থ ঐতিহাসিক নাটক হতে পারেনি। তিনি যুগের দাবি মেটাতে গিয়ে ঐতিহাসিক নাটক লিখেছিলেন, কিন্তু বিশুদ্ধ নাটকরচনার দাবি মেটাতে পারেননি।

তাঁর কয়েকখানি গার্হস্থ্য নাটক (দু-একখানিতে সমাজ-জীবনের ইঙ্গিতও আছে) এক সময়ে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল—সে জনপ্রিয়তা এখনকার খুব কম নাট্যকারের ভাগ্যে জুটে থাকে। তাঁর ‘প্রফুল্ল’ নাটকের জনপ্রিয়তার কথা প্রায় অবিশ্বাস্য। সুদূর পূর্ববঙ্গ থেকে অনেক দর্শক কলকাতায় আসতেন শুধু ‘প্রফুল্ল’র অভিনয় দেখবার জন্য। অনেকে বসবার আসন না পেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নাটক দেখতেন। গিরিশচন্দ্র বাগবাজার অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। ঐ অঞ্চলের মধ্যবিত্ত পরিবারের নানা সমস্যা, দুঃখবেদনা, কারও কারও চারিত্রিক অধোগতি ও পানাসক্তি—যার ফলে অনেক পরিবার উচ্ছিন্ন যেত, তিনি তাদের সব সংবাদ রাখতেন। নাটকে তিনি সেই পারিবারিক ও গার্হস্থ্য সমস্যাগুলিকে করুণরসের দ্বারা মূর্ত করে তুলেছিলেন। একটা বিশেষ অঞ্চলের সমস্যা গোটাদেশের সমস্ত পরিবারের সমস্যারূপেই দেখা দিয়েছিল। তাঁর ‘প্রফুল্ল’ (১৮৮৯), ‘হারানিধি’ (১৮৯০), ‘বলিদান’ (১৯০৫), ‘শান্তি কি শাস্তি’ (১৩১৫ বঙ্গাব্দ), ‘মায়াবসান’ (১৮৯৮) প্রভৃতি নাটক মূলত পারিবারিক নাটক। অবশ্য কোনো কোনোটিতে সামাজিক সমস্যা (যেমন, ‘বিধবা বিবাহ’) ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের (‘মায়াবসান’) কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে। মদ্যাসক্তি, পারিবারিক বিরোধ, ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, কুমারী ও বিধবার বিবাহ-সমস্যা, লাম্পট্য, জালজুয়াচুরি, মামলা-মোকদ্দমা—এই বিষয়গুলি তাঁর পারিবারিক নাটকে ঘুরে ফিরে এসেছে। তখন একান্নবতী পরিবারে ফাটল ধরেছে, সেই ভাঙা পরিবারের ছবি তাঁকে অনেক সময় এই ধরনের নাটক লিখতে উৎসাহ দিত। অবশ্য তাঁর সামাজিক নাটকগুলিতে অনেক সময়েই বিশেষ কোনো তীক্ষ্ণ ও দুরূহ সমস্যার বিশ্লেষণ ও সত্যরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা নেই, করুণ রসাত্মক (‘প্রফুল্ল’) নাটকের পিছনে ট্রাজেডির কোনো অমোঘ তাড়না নেই। কয়েকজন দুর্বৃত্ত ও লাম্পটে ভালোমানুষের চরিত্রে দু-একটি ছিদ্র পেয়ে তার মধ্যে আশ্রয় নেয় এবং সেই সৎলোকটিকে অধঃপাতের চরম তলায় টেনে নিয়ে যায়—তাঁর অধিকাংশ সামাজিক ও পারিবারিক নাটকের এই হল মূল অবলম্বন। ‘প্রফুল্ল’ নাটকটি সেযুগে এবং এযুগেও শ্রেষ্ঠ পারিবারিক ট্রাজেডি বলে বিখ্যাত হয়েছে। দোষেগুণে এটিই গিরিশ-প্রতিভার সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি। কেমন করে যোগেশের ‘সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল’ এই নাটকে সেই মর্মস্তুদ ঘটনা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আবেগের সঙ্গে বলা হয়েছে। এর করুণরস আবেগবহুল হলেও খাঁটি মানবিক বলে অভিনয়ে এখনও এ নাটক অতিশয় জনপ্রিয়। তবে বিশুদ্ধ ট্রাজেডির আদর্শে বিচার করলে ‘প্রফুল্ল’কে যথার্থ ট্রাজেডি বলা যাবে না। অতি-নাটকীয়তা, খুনজখম, মাতলামি প্রভৃতির বাড়াবাড়ির ফলে এর ট্রাজিক রস বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে—ট্রাজেডির সান্ত্বনাহীন হতাশা, শুষ্ক নয়নের অগ্নিজ্বালা—গিরিশচন্দ্র কেন, কোনো বাঙালি নাট্যকারই আয়ত্ত করতে পারেননি। সুতরাং ‘প্রফুল্ল’ করুণরসের নাটক হলেও ট্রাজেডি হিসেবে বিশেষ সার্থক হয়নি। তাঁর অন্যান্য সামাজিক নাটক সম্বন্ধে ঐ একই কথা বলা যায়। অবশ্য দু-এক জায়গায় করুণ বেদনা ও অশান্ত দুঃখ অতি চমৎকার মানবিক গুণাবিত হয়েছে। নিম্নে ‘প্রফুল্ল’ নাটক থেকে কনিষ্ঠা বধূ প্রফুল্ল ও তার জ্যেষ্ঠ ভাণ্ডারের নিপীড়িত বালকপুত্রের এই সংলাপটি অশ্রুপ্লাবিত করুণরসে সার্থক হয়েছে, তা না বললে গিরিশচন্দ্রের প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করা হবে।

প্রফুল্লের প্রবেশ

প্রফুল্ল : এই যে আমার যাদব! যাদব, যাদব, বাবা!

যাদব : কে-ও কাকিমা এসেছে? আমায় একটু জল দাও। (প্রফুল্লের জল দেওন) আমি আর খেতে পাচ্ছিনি, আমার চোখে কানে জল দাও; কাকিমা, আমায় না খেতে দিয়ে কাকা মেরে ফেলে।

প্রফুল্ল : পরমেশ্বর, কি কল্লে! ও বাবা, এই দুধ খাও।

যাদব : আর গিলতে পার্ব না, গলা আটকে গিয়েছে ; দেখলে না, জল গিলতে পাল্লেম না ; কাকিমা, মা কি বেঁচে আছে? বেঁচে থাকলে মা আমার খুঁজে খুঁজে আসত। যদি বেঁচে থাকে, তোমার সঙ্গে দেখা হয়, বোলো না, আমি না খেতে পেয়ে মরেছি। আমায় আধপেটা ভাত দিত, মা কাঁদত, খেতে পাইনি শুনলে, মা আমার বুক চাপড়ে মরে যাবে। কাকিমা, বোলো, আমি ব্যামোতে মরেছি।

প্রফুল্ল : বালাই! বালাই! ছি বাবা, ও-সব কথা বলতে নেই। যাদব, বাবা, বাবা! পরমেশ্বর রক্ষা কর।

(৫ম অঙ্ক, ৪র্থ গভাক্ষ)

গিরিশচন্দ্র কতকগুলি রঙ্গব্যঙ্গ নাটিকা ('সপ্তমীতে বিসর্জন', 'বেল্লিকবাজার', 'বড়দিনের বখশিস', 'সভ্যতার পাণ্ডা', 'য্যায়সা কি ত্যায়সা' প্রভৃতি) রচনা করেছিলেন, তাঁর যুগে এগুলির বেশ অভিনয়ও হয়েছিল। কিন্তু এখন আমরা দেখছি, হাস্যরসের এই প্রহসনগুলির হাসির মূল উৎস—লেখকের হাস্যরসসৃষ্টির শোচনীয় অক্ষমতা। এর সংলাপ অস্বাভাবিক ও 'স্ল্যাং', কাহিনী নামমাত্র, এর ধরনধারণ ঠিক যেন ভদ্ররুচির উপযোগী নয়। তবে 'আবুহোসেন' গীতিনাট্যটি নিতান্ত মন্দ নয়।

প্রসঙ্গক্রমে তাঁর পরিকল্পিত ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের উল্লেখ করা যেতে পারে। অভিনয় শিক্ষা দিতে গিয়ে তিনি দেখলেন মধুসূদনের চৌদমাত্রার অমিত্রাক্ষর ছন্দ অভিনয়ে বড়ো দুর্ভাগ্য হয়ে পড়ে। তখন তিনি উচ্চারণ ও অভিনয়ের সুবিধার জন্য চৌদমাত্রার পংক্তিকে ভেঙে ছোটো ছোটো ছত্রে সাজিয়ে নিলেন। এই ছন্দোবৈচিত্র্যে তাঁরই নামানুসারে 'গৈরিশ ছন্দ' নামে পরিচিত হয়েছে। অভিনেতা ও অভিনয়-শিক্ষকরূপে তিনি এই যে নতুন ছন্দের উদ্ভাবন করলেন, পরবর্তিকালেও অন্যান্য নাট্যকার তা গ্রহণ করেছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের নাটকে নানা ক্রটি থাকলেও একনিষ্ঠ সরলতার জন্য এগুলির অভিনয়মূল্য অস্বীকার করা যায় না। বাস্তবিক তাঁর রচনার মধ্যে কৃত্রিমতার ঠাঁই ছিল না। তবে শুধু অকৃত্রিমতাই শ্রেষ্ঠ নাটকের একমাত্র গুণ নয়। রচনার সংযম ও সৌষ্ঠব, চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, জীবন সম্বন্ধে নাট্যকারের গভীর প্রত্যয়—এসব তাঁর কতটা আয়ত্ত্ব হয়েছিল তা অবশ্য আজকের সমালোচক জিজ্ঞাসা করতে পারেন এবং তার যৌক্তিক উত্তর না পেলে নটগুরু গিরিশচন্দ্রের নাট্যকারের গৌরব কিছু খর্ব করতে চাইলে তাঁকে বিশেষ দোষ দেওয়া যাবে না।

১. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)

ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (নাটকের ক্ষেত্রে যিনি নামের ইংরেজি আদ্যক্ষর ডি. এল. রায় নামে পরিচিত) ভালো ছাত্র হিসেবে বিলেত গিয়েছিলেন। সেখানে অধ্যয়নের অবকাশে তিনি পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্য ও নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন। অবশ্য এর পূর্বেই তাঁর কাব্য-প্রতিভার উদ্গম হয়েছিল, বিদেশে গিয়ে তিনি স্বদেশিভাব নিয়ে ইংরেজি কবিতা লিখে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশও করেছিলেন। পরবর্তিকালে দেশে ফিরে সরকারি কর্মে নিযুক্ত থেকে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। অবশ্য প্রথমে তাঁর আবির্ভাব হয় প্রহসনকার হিসেবে, তারপর তিনি যথার্থ নাটক লিখে বাংলা ও বাংলার বাইরে জনপ্রিয় নাট্যকাররূপে

সম্মান লাভ করেন। ভারতের নানা প্রাদেশিক ভাষাতেও ডি. এল. রায়ের নাটকের অনুবাদ হয়েছে। তাঁর গীতিকাব্যসংগ্রহ ও হাসির গান ও কবিতার সংকলন বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিকতা ভাঙতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। বিশেষত তাঁর হাসির গান আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম জীবনে নাট্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন কয়েকখানি প্রহসন নিয়ে। ‘কঙ্কি অবতার’ (১৮৯৫), ‘বিরহ’ (১৮৯৭), ‘ব্রাহ্মপর্শ’ (১৯০০), ‘প্রায়শ্চিত্ত’ (১৯০২), ‘পুনর্জন্ম’ (১৯১৯) প্রভৃতি প্রহসন একদা অভিনয়ে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল—অবশ্য সবগুলি রসোত্তীর্ণ হয়নি। ‘কঙ্কি অবতার’ এবং ‘বিরহে’র হাস্যপরিহাস মোটামুটি মন্দ হয়নি, কিন্তু তাঁর হাসির গানের তুলনায় রঙ্গনাট্যগুলিতে রঙ্গরহস্য বেশি খেলেনি। সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল নানা কারণে রবীন্দ্র-বিরোধী হয়ে পড়েছিলেন। ‘আনন্দবিদায়’ (১৯১২) নামে একখানি রঙ্গপ্রহসনে তিনি রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে রুচিবান পাঠক ও দর্শকের দ্বারা ভৎসিত হয়েছিলেন। মারমুখী জনতার প্রতিবাদে প্রথম অভিনয়ের রাত্রিতেই কর্তৃপক্ষ এই নাটক বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন, নাট্যকারও (যিনি উপস্থিত ছিলেন) কিছু অপমানিত হয়েছিলেন। ব্যক্তিগত এবং কুরুচিপূর্ণ আক্রমণের জন্য প্রহসন হিসেবে ‘আনন্দবিদায়’ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল পৌরাণিক আবহাওয়াকে অস্বীকার করতে পারেননি। তাঁর ‘পাষাণী’ (১৯০০), ‘সীতা’ (১৯০৮) এবং ‘ভীষ্ম’ (১৯১৪) নাটকগুলিতে পৌরাণিক কাহিনীকে নতুনভাবে উপস্থিত করার চেষ্টা দেখা যায়—পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার জন্যই তিনি ভক্তিরসে পূর্ণ পৌরাণিক কাহিনীকে খানিকটা আধুনিক ছাঁচে ঢেলে নিয়েছেন। ফলে পৌরাণিক চরিত্রে আধুনিক যুগের ভাববৈশিষ্ট্য, বিশেষত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সংযুক্ত হয়েছে। কিন্তু নাটকীয় অভিনয়যোগ্যতায় এগুলি বিশেষ ঐশ্বর্যবান নয়। তাঁর দু’খানি সামাজিক ও পরিবারিক নাটক (‘পরপারে’—১৯১২, ‘বঙ্গনারী’—১৯১৬) খুব সার্থক না হলেও উত্তেজক ঘটনায় (সেই-জখম-ফাঁসি ইত্যাদি) পূর্ণ বলে একদা কিছু জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কিন্তু এ দুটির নাট্যলক্ষণ বিশেষ নেই, সাহিত্যলক্ষণ আরও কম।

দ্বিজেন্দ্রলাল যে বাংলা ও বাংলার বাইরে পরিচিত হয়েছেন, বাংলা নাট্যসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, এর কারণ তাঁর ঐতিহাসিক নাটক ‘প্রতাপসিংহ’ (১৯০৫), ‘দুর্গাদাস’ (১৯০৫), ‘নূরজাহান’ (১৯০৮), ‘মেবারপতন’ (১৯০৮) এবং ‘সাজাহান’ (১৯০৯)—রাজপুত বীরত্ব ও মুঘলযুগের কাহিনীগুলিতে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছেন। বন্ধুদের অনুরোধে তিনি হিন্দুযুগের—দু’খানি নাটক রচনা করেন, ‘চন্দ্রগুপ্ত’ (১৯১১), ‘সিংহল বিজয়’ (১৯১৫)। এর মধ্যে ‘নূরজাহান’, ‘সাজাহান’ ও ‘চন্দ্রগুপ্ত’ সে যুগে কি রকম জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, বৃদ্ধ ব্যক্তির তাই সাক্ষ্য দিতে পারেন। এখনও পেশাদারী ও শৌখিন নাট্যসমাজে দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র খর্ব হয়নি। বাংলার বাইরে অন্য প্রাদেশিক ভাষায় এই সমস্ত নাটক অনূদিত হয়ে বাঙালির নাট্যপ্রতিভাকে জয়যুক্ত করেছে। ১৯০৫ সালের স্বাদেশিক উত্তেজনাপূর্ণ আত্মত্যাগের পটভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল এই বীররসাত্মক উদ্দীপনাসঞ্চারকারী আদর্শবাদের অপূর্ব নাটক রচনা করে বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, নিজের নাট্যপ্রতিভার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন এবং গিরিশচন্দ্রের সুলভ ভক্তিরসাত্মক পৌরাণিক নাটকের স্থলে রণরঙ্গমুখর ইতিহাসকে রঙ্গক্ষেত্রে টেনে এনে নাটকের ক্ষেত্রে একপ্রকার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছেন। নূরজাহানের ক্ষমতালাভের সঙ্গে নারীহৃদয়ের দম্ভ, সাজাহানের পিতৃসন্তা ও সম্রাটসন্তার বিরোধ, পরিশেষে পিতৃসন্তার জয়লাভ, ‘চন্দ্রগুপ্ত’ চাণক্যচরিত্রের হৃদয় ও ক্ষমতার

দ্বন্দ্ব নাট্যকার অতি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের রৌদ্র রসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি রচিত হলেও সমসাময়িক ঘটনা ও জনরুচির তাড়নায় তিনি প্রায় কোথাও ইতিহাসকে বিকৃতি করেননি। অবশ্য ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবে বাধ্য হয়ে তাঁকে খানিকটা কল্পনার সাহায্য নিতে হয়েছে, কিন্তু জ্ঞানত এবং বিনা কারণে তিনি ইতিহাসকে অতিক্রম করেননি। এই রকম একটা অভিযোগ চলে আসছে বটে যে, দ্বিজেন্দ্রলাল নাকি নাটকের অনুরোধে ইতিহাসকে বদলে নিয়েছেন। অবশ্য শেক্সপীয়ারও নাটকের জন্যই ইতিহাস অবলম্বন করেছিলেন, ইতিহাসের জন্য নাটক লেখেননি। আমাদের নাট্যকারও সেই রীতিতে ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছেন, একটু-আধটু ইতিহাস-বিচ্যুতি থাকলে তাতে নাটক বা ইতিহাসের মারাত্মক ক্ষতি হয় না। সব দিক বিবেচনা করে দ্বিজেন্দ্রলালকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাট্যকার বলা যেতে পারে।

তাঁর এই ধরনের নাটকের চরিত্রচিত্রণরীতি, মানসিক দ্বন্দ্ব প্রভৃতিতে শেক্সপীয়ারীয় রীতি অনুসৃত হয়েছে, কারণ তিনি ছিলেন শেক্সপীয়ারের ভক্তপাঠক। কিন্তু আবেগতরল এবং উত্তপ্ত বাগ্ধারা ভাষারীতির উত্থানপতন (ক্রাইম্যান্স-অ্যান্টিক্রাইম্যান্স), অপূর্ব কাব্যধর্মী গম্গমে সংলাপ—এসব তিনি জার্মান নাট্যকার শীলারের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তাঁর নাটকে অভিনয়ের অতিরিক্ত পাঠযোগ্য সাহিত্যগুণও খুব উচ্চস্তরের হয়েছে। গিরিশচন্দ্রকে ছেড়ে দিলে তাঁকে ঐতিহাসিক নাটক রচনার পথিকৃৎ বলতে হবে। ইতিহাসকে এমনভাবে চাক্ষুষ করে তোলা, ঐতিহাসিক নরনারীকে জীবন্ত করা এবং তারই সঙ্গে সমসাময়িক বাংলাদেশের সঙ্গে নাটকগুলির আন্তরিক যোগস্থাপন করা—এতে তিনি অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের সীমা ও প্রভাব সম্বন্ধেও অনবহিত হয়ে থাকা যায় না। অতি উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক নাটক লিখলেও কোনো কোনো স্থলে তাঁর চরিত্র, সংলাপ ও নাটকীয় পরিস্থিতি অত্যন্ত কৃত্রিম বলে মনে হয়, গালভরা শব্দবিন্যাসও শূন্যগর্ভ হয়ে ওঠে। ভাষার কৃত্রিমতা ও অতিনাটকীয়তা তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মৌলিক ত্রুটি। সংলাপের দ্বারা নাটকীয় চরিত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সঞ্চারিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের কুশীলবেরা সকলেই এক ধরনের কাব্যময় অলংকারবহুল ভাষা এমনভাবে ব্যবহার করে যে, চরিত্রগুলির সংলাপজনিত স্বাতন্ত্র্য মুছে যায়। উপরন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল ভাবাবেগ ও আদর্শবাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অনেক সময়ে নাটকীয় পরিস্থিতির বাস্তবতাকে ক্ষুণ্ণ করেছেন। এই ত্রুটিগুলি বোধ হয় শীলারের প্রভাবে এসে থাকবে, কারণ শীলারের নাটকেও এই ত্রুটি আছে। এসব ত্রুটি সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলাল যে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাট্যকার তাতে সন্দেহ নেই—তার বড়ো প্রমাণ, এখনও দ্বিজেন্দ্রলালের ঐ জাতীয় নাটকাভিনয় দেখতে প্রচুর দর্শক সমাগম হয়ে থাকে। অবশ্য তাঁর নাটকের সংলাপের মধ্যে যে-ধরনের অলংকার-সমৃদ্ধ ঝংকার আছে, তা পাঠক ও দর্শককে মুগ্ধ করলে বিশ্বয়ের কারণ নেই। এখানে এই ধরনের দুটি উদ্ধৃতি লক্ষ্য করা যেতে পারে :

১. চন্দ্রগুপ্ত :

চাণক্য—জগতে এই প্রথম হ'ল যে, সন্তান মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নেয় না! [মুরাকে] কাঁদো অভাগিনী নারী! এই তোমার পুত্র! মা চেনে না!—জানে না যে, জগতে যত পবিত্র জিনিস আছে, মায়ের কাছে কেউ নয়!

চন্দ্রগুপ্ত—তা জানি গুরুদেব।

চাণক্য—না, জানো না! নইলে মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতে সন্তান দ্বিধা করে? মা—যার সঙ্গে একদিন এক অঙ্গ ছিল—একপ্রাণ একমন, একনিঃশ্বাস, এক আত্মা—যেমন সৃষ্টি একদিন বিষ্ণুর যোগনিদ্রার অভিভূত ছিল—তার পর পৃথক হয়ে এল—অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মতো, সঙ্গীতের মূর্ছনার মতো, চিরন্তন প্রহেলিকার প্রশ্নের মতো! মা—যে তার দেহের রক্ত নিংড়ে, নিভৃতে বন্ধের কটাহে চড়িয়ে মেহের উত্তাপে জ্বাল দিয়ে সুধা তৈরি করে তোমাকে পান করিয়েছিল—যে তোমার অধরে হাস্য দিয়েছিল, রসনায় ভাষা দিয়েছিল, ললাটে আশিসচূষন দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিল; মা, রোগে শোকে, দৈন্যে, দুর্দিনে তোমার দুঃখ যে নিজের বুক পেতে নিতে পারে, তোমার স্নান মুখখানি উজ্জ্বল দেখবার জন্য যে প্রাণ দিতে পারে, যার স্বচ্ছ মন্দাকিনী এই শুষ্ক তপ্ত মরুভূমিতে শত ধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে যাচ্ছে...এ সেই মা।

২. সাজাহান (শেষ দৃশ্য) :

জাহানারা—ঔরংজীব! এখানে তোমার জয় সম্পূর্ণ হলো। ঔরংজীব—আমার এই জীর্ণ মুমূর্ষু পিতার অনুরোধে আমি তোমায় ক্ষমা করলাম! (মুখ ঢাকিলেন)

বেগে জহরৎ উম্মিসার প্রবেশ

জহরৎ—কিন্তু আমি ক্ষমা করি নাই ঘাতক! পৃথিবী শুদ্ধ যদি তোমায় ক্ষমা করে আমি করব না। আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি; ক্রুদ্ধ ফণিনীর উষ্ম নিশ্বাসে আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি। ...সেই অভিশাপের বিকট ধ্বনি যেন তোমার সকল বিজয়বাদ্যে বেসুরো বেজে ওঠে। তুমি আমার পিতাকে (অর্থাৎ দারা শিকোহ) হত্যা করে' যে সাম্রাজ্য অধিকার করেছে, সেই সাম্রাজ্য ভোগ কর; যেন সেই সাম্রাজ্য তোমার কালস্বরূপ হয়; যেন সে পাপ থেকে গাঢ়তর পাপে তোমায় নিক্ষেপ করে, যাতে মরবার সময় তোমার ঐ উত্তপ্ত ললাটে ঈশ্বরের করুণার এক কণাও না পাও!

[সাজাহান, ঔরংজীব ও জাহানারা তিনজনেই শির নত করিলেন]

■ গ. বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৭-১৯৭৮) ■

বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে বাংলা নাট্য ক্ষেত্রে যে নামটি বারবার ঘুরে ফিরে উচ্চারিত হয়, সে নাম বিজন ভট্টাচার্য। তিনি জন্মেছিলেন বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার খানাপুর গ্রামে ১৭ জুলাই ১৯২৭ (মতান্তরে ১৫ জুলাই ১৯১৫)। বাংলা নাট্য জগতে বিজন ভট্টাচার্য এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি এমন এক সময়ে নাট্য রচনায় আত্ম নিয়োগ করেন, যখন বাংলা নাটকে চলছে বন্দ্যাদশা। তখন পেশাদারী রঙ্গালয়গুলি নতুন নাট্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবার বাসনা হারিয়ে ফেলেছে। ঐতিহাসিক, ধর্মমূলক, পৌরাণিক ও সামাজিক নাটক যা সে সময় লেখা হচ্ছিল তাতে সমকালের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হতে পারছিল না। তখন স্বাধীনতার যুদ্ধ তীব্রতর হচ্ছে। বিশ্বযুদ্ধ নতুন দিকে মোড় নিচ্ছে। জার্মানীর হিটলারের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় মিত্রপক্ষে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছে তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়া। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্বযুদ্ধকে জনযুদ্ধ নামে অভিহিত করেছে। জাপানী বোমার ভয়ে সরকার এবং জনসাধারণ ভীত সন্ত্রস্ত। সান্থ্য আইন জারি হয়েছে, দেখা দিতে শুরু করেছে পঞ্চাশের মন্বন্তরের অশুভ লক্ষণ। বিজন এই ঘোরতর সময়কে প্রত্যক্ষ করলেন। স্বাভাবিক কারণে তাঁর নাটক লেখার রসদ তিনি তাঁর, হাতের নাগালের মধ্যেই পেয়ে গেলেন।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দেই স্থাপিত হল ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের বাংলা শাখা। বিজন এই শাখার একজন সক্রিয় নাট্যকর্মীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। গণনাট্য সঙ্ঘের প্রয়োজনেই বিজন নাট্যরচনায় আত্ম নিয়োগ করেন। তাঁর নাট্য তালিকায় রয়েছে ১৪খানি পূর্ণাঙ্গ নাটক, ৯ খানি একাঙ্ক নাটক এবং ১ খানি করে গীতি নাট্য ও রূপক নাট্য। ১৪ খানি পূর্ণাঙ্গ নাটকের নাম— ১. নবান্ন, ২. অবরোধ, ৩. জতুগৃহ, ৪. গোত্রান্তর, ৫. মরাচাদ, ৬. মাষ্টার মশাই, ৭. দেবীগর্জন,

৮. ধর্মগোলা, ৯. কৃষ্ণপক্ষ, ১০. গর্ভবতী জননী, ১১. সোনার বাংলা, ১২. আজ বসন্ত, ১৩. গুপ্তধন এবং ১৪. চলো সাগরে। এই তালিকাধৃত মাষ্টার মশাই ও গুপ্তধন মৌলিক নয়, রবীন্দ্রনাথের দুটি বিখ্যাত গল্পের পূর্ণাঙ্গ নাট্যরূপ। গল্প দুটির নাম যথাক্রমে মাষ্টার মশাই ও গুপ্তধন। বিজনের ৯ খানি একাঙ্ক নাটকের নাম—১. আগুন, ২. জ্বানবন্দী, ৩. মরাচাঁদ, ৪. কলঙ্ক, ৫. জননেতা, ৬. সাম্রিক, ৭. লাস ঘুরিয়া যাউক, ৮. চুল্লী এবং ৯. হাঁসখালির হাঁস।

গীতি নাট্য ও রূপক নাট্য দুটির নাম যথাক্রমে জীবন কন্যা ও স্বর্ণকুন্ত।

পূর্ণাঙ্গ নাটক ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত নবান্ন চার অঙ্কের নাটক। অঙ্কগুলি দৃশ্যে বিভাজিত। প্রত্যেকটি দৃশ্য স্বয়ং সম্পূর্ণ। প্রত্যেকটি দৃশ্যে জনগণের দুঃখ ও দুর্গতির রূপ নির্মমভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই উদ্ঘাটন প্রক্রিয়া অনেকখানি এপিসোডিক (episodic) হয়ে উঠেছে। নাটকটির প্রথম ও চতুর্থ অঙ্কের পটভূমি আমিনপুর গ্রাম। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কের ঘটনা কলকাতা কেন্দ্রিক। অবশ্য দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে পুনরায় এসেছে আমিনপুর গ্রামের প্রসঙ্গ। এই দৃশ্যে দেখান হয়েছে কেমন করে গ্রাম থেকে নারী পাচার করা হয় শহরের গোপন আস্তানায়। নবান্ন নাটকের অঙ্কগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য জনগণের দুঃখ দুর্দশার চিত্র উদ্ঘাটন করা। কেমন করে গ্রামের মানুষ জীবন বাজি রেখে আগুট আন্দোলনে যোগ দিয়ে পুলিশী নির্যাতনের শিকার হয়ে লড়াই করেছে স্বাধীনতার জন্য কেমন করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মন্বন্তরের জ্বালায় দগ্ধ হয়েছে এবং অবশেষে প্রাণে বাঁচার অভিপ্রায়ে তারা শহরে চলে এসেও দুর্গতির হাত থেকে মুক্তি পায়নি আবার গ্রামে যাবার সংকল্পে দৃঢ় হয়েছে। অবশেষে গ্রামে ফিরে এসে সমবেত প্রয়াসে বাঁচার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে। তারই কাহিনী একের পর বিন্যস্ত হয়েছে এই নাটকে। এই নাটক দুর্গতির হাত থেকে সংঘবন্দ প্রয়াসে বাঁচার পথ দেখায়। চার অঙ্কের এই নাটকের মধ্যে আছে পনেরোটি দৃশ্য। প্রথম অঙ্কের দৃশ্য সংখ্যা পাঁচ, দ্বিতীয় অঙ্কের পাঁচ, তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কের দৃশ্য সংখ্যা যথাক্রমে দুই ও তিন।

নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে আমিনপুর গ্রামের সমাদ্দার পরিবার। এই পরিবারের প্রধান সদস্যের নাম প্রধান সমাদ্দার। সপরিবারে আগুট আন্দোলনে যোগ দিয়ে প্রধান সমাদ্দারের স্ত্রী পঞ্চাননী প্রাণ দিয়েছে।

মন্বন্তরে আমিনপুরের বিভিন্ন পরিবারের সদস্যের সঙ্গে সমাদ্দার পরিবারও নানা দুর্গতির শিকার হয়। খাদ্যের সন্ধানে সমাদ্দার পরিবারের সদস্যরা অন্যান্য ক্ষুধার্ত নরনারীর সঙ্গে শহরে এসে ভিড় জমায়। অনাহারে অপুষ্টিতে প্রধান সমাদ্দারের শরীর কঙ্কালসার হয়ে গড়ে। প্রধানের কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র নিরঞ্জন চাকরির চেষ্টায় ইতিপূর্বেই শহরের এক চালের আড়তে মুটের কাজ পায়। একদিন নিরঞ্জন লক্ষ্য করে তার চালের আড়তদারের মালিকের নারী উদ্ধার আশ্রমে আনীত হয়েছে তারই স্ত্রী বিনোদিনী। নিরঞ্জন তখনই পুলিশের হাতে আড়তদারের মালিক এবং নারী পাচারকারীদের তুলে দিয়ে স্ত্রী বিনোদিনীকে নিয়ে আমিনপুরে ফিরে আসে। গ্রামে ফিরে অন্যান্য হিন্দু মুসলমান কৃষকদের সঙ্গে মিলে সে শস্য ভাণ্ডার গড়ে তোলে। ফেলে যাওয়া জীর্ণ গৃহ সংস্কার করে যখন নিরঞ্জন সচ্ছল সংসারের সুখ স্বপ্নে বিভোর, তখন গ্রামে ফিরে আসে তার দাদা সস্ত্রীক কুঞ্জ। গ্রামের সবাই নবান্ন উৎসব নিয়ে ব্যস্ত তখন ফিরে আসে প্রধান সমাদ্দার। সবাই তখন নতুন করে বাঁচার। মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়। এখানেই নাটকের সমাপ্তি। এই সমাপ্তি প্রমাণ করে নাটকের নামকরণ সার্থক।

নবান্ন নাটকে বহুচরিত্রের ভিড়। চরিত্রগুলির মধ্যে নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যাই অধিক। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে আছে প্রধান সমাদ্দার, তার দুই ভাই পো—কুঞ্জ ও নিরঞ্জন, প্রধানের প্রতিবেশী দয়াল মণ্ডল, হারু দত্ত, কালীধন ধাড়া, রাজীব, নির্মলবাবু, বরকত, ফকির প্রমুখ গ্রামবাসী। আছে এক বালক চরিত্র। তার নাম মাখন। এই পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রধান, কুঞ্জ, নিরঞ্জন, দয়াল মণ্ডল, হারু দত্ত, কালীধন ধাড়া প্রভৃতি। কালীধন ধাড়া ও হারু দত্ত, মন্বন্তরের দৌলতে আড়তদারি, কালোবাজারি ও নারী পাচারের ব্যবসায় নেমে প্রভূত অর্থের মালিক হয়েছে। নারী চরিত্রগুলি হল পঞ্চাননী, রাধিকা, বিনোদিনী ও খুকীর মা। প্রধান সমাদ্দার একজন জীবনপণ করা স্বাধীনতা সংগ্রামী। কিন্তু পঞ্চাশের মন্বন্তরের দুর্যোগে সে ছন্নছাড়া হয়ে পড়েছে। দেখা দিয়েছে তার শারীরিক ও মানসিক বিকৃতি। সারা অজ্ঞো অজানা ব্যথা নিয়ে ডাক্তারবাবুর গেলে, ডাক্তারবাবু তাকে পাগল ঠাওরায়। অবশেষে প্রধান ফিরে আসে তার আপন গ্রামে। যোগ দেয় নবান্ন উৎসবে। সে ফিরে পায় তার মানসিকতা। বাঁচার উল্লাসে সে হাত মেলায় সবার সঙ্গে।

কুঞ্জ সমাদ্দার পরিবারের কর্তা। কিন্তু অভাবে উপবাসে সে তার মানসিকতা হারিয়ে ফেলেও পুনরায় গ্রামে ফিরে এসে সে নবজীবনের বাঁচার প্রেরণায় উৎফুল্ল হয়। নিরঞ্জন আপাতদৃষ্টিতে দায়-দায়িত্বহীন বলে মনে হলেও যথাসময়ে তার সাংসারিকবোধ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেছে। এমনকি ভারতছাড়ো আন্দোলনেও সে যোগ দিয়েছে। দয়াল মণ্ডল প্রাকৃতিক দুর্যোগে পত্নীহারা হয়ে অভাবের মধ্যেও গ্রাম ত্যাগ করেনি। তার বিষয় বুদ্ধি তার গ্রামের অসহায় মানুষকে দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচার প্রেরণা দিয়েছে।

পঞ্চাননীকে নাট্যকার ঐকেছেন ১৯৪২-এর ভারতছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়ে মৃত্যুবরণকারিণী, মাতঙ্গিনী হাজারার আদলে। রাধিকা এবং বিনোদিনী যথার্থ গৃহবধূ। নবান্ন নাটকে বিজন গ্রামীণ জীবনের নানা উৎসব অনুষ্ঠানের পরিচয় দিয়েছেন। ফকিরের গান মোরগ লড়াই ঘাঁড়ের লড়াই নৌকা বাইচ প্রভৃতি লোকজীবনের মনোজ্ঞানের উপাদানের সমাবেশ ঘটান হয়েছে। নবান্ন নাটকে গ্রামীণ এবং শহুরে উভয় প্রকৃতির মানুষের ভিড় লক্ষিত হবে। গ্রামীণ মানুষের মুখের সংলাপে এসেছে মেদিনীপুর ও খুলনার ভাষাগত লবজ।

গণনাট্য সঙ্ঘের নির্দেশ মান্য করে নবান্ন লেখা হলেও নাটকটি শেষ ত্রুটি হীন হতে পারেনি। নাটকের শেষতম দৃশ্যটি নাটকের দুর্বলতম অংশ। আসলে বিজন ছিলেন আগোছালো মানুষ। তাঁর সেই আগোছালোপনার জন্যই নাটকের নানা ঘটনা সন্নিবেশে ঘটেছে নানা অসংগতি। তবুও বলতে হবে নবান্ন অভিনয়ের ফলে বাংলা নাট্য জগতে এসেছে প্রভূত পরিবর্তন। তারফলে নাটকটির উপস্থাপনার একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ভূমিকার জন্ম হয়েছে।

অবরোধ নাটকটি বিজন লেখেন শ্রমিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। নাটকটি ছয় অঙ্কের। ন্যাশান্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হেমন সেন শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি করেন শ্রমিকদের একটি আর্থিক দাবির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন না করে। শ্রমিকদের দাবি ছিল মূল বেতনের সঙ্গে মহার্য্যভাতাকে যুক্ত করতে হবে। হেমন সেন এই দাবি না মেনে শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাকে পৃথক সুবিধা দান করে শ্রমিক আন্দোলনকে ভেঁতা করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য তিনি সরকারী ষোলো লক্ষ টাকার অর্ডার সরবরাহ করার জন্য শ্রমিকদের কাজ চালিয়ে

যেতে নির্দেশ দেন। পরিবর্তে তিনি প্রাপ্য লভ্যাংশ থেকে শ্রমিকদের ডিভিডেন্ড হিসেবে কিছু অর্থ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। শ্রমিক নেতা ঈশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গে তখন মিঃ হেমেন সেনের অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শ্রমিকরা ঈশ্বর পণ্ডিতকে মালিকের দালাল বলে অভিহিত করে। কিন্তু ঈশ্বর পণ্ডিত মালিকের কথায় সম্মত না হওয়ার অপরাধে গুড়ার আক্রমণে বিধ্বস্ত। মালিকপক্ষ তখন শ্রমিক আন্দোলন ধ্বংস করার মানসে পাঁচটা শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ার চেষ্টায় সক্রিয় হয়। অবশেষে কারখানায় লকআউট ঘোষিত হয়। শ্রমিক নেতা ঈশ্বর পণ্ডিতের নেতৃত্বে শুরু হয় ধর্মঘট।

কারখানার অশান্তির মধ্যেই হেমেন সেনের পারিবারিক বিপর্যয়ও দানা বাঁধতে থাকে। ঘরে সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও মিঃ সেন পরস্ত্রী সাবিত্রীর সঙ্গে গোপন প্রণয়ে আবদ্ধ। এই ত্রিকোণ প্রেম নিয়ে নাটকে একটি পার্শ্বকাহিনী তৈরি হয়েছে।

নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে দেখা গেছে কারখানার মালিক যখন কারখানা খোলা রাখার জন্য কিছু শ্রমিককে নিজ দলে টেনে আনছেন, তখন সংগ্রামী শ্রমিক সাধারণ জোর করে কারখানায় ঢুকে মালিককে অবরুদ্ধ করে রাখে। এই দিক থেকে নামকরণ সার্থক।

অবরোধ নাটক বিজন গণনাট্য সঙ্ঘের জন্য লিখলেও নাটকটি গণনাট্য সঙ্ঘের দ্বারা প্রযোজিত হয়নি। এই নাটক কেন অভিনীত হয়নি তার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন সুধী প্রধান। তাঁর মতে, বিজন ভট্টাচার্য কারখানা ও পুঁজিবাদী ব্যাপার সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন না। আর শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলনের প্রকৃত কৌশলগত দিক সম্পর্কেও বিজন অনবহিত ছিলেন। সুধী প্রধান যাই বলুন, বিজন শ্রমিক ও মালিক পক্ষের দাবিদাওয়া ও অধিকার সম্পর্কিত বিরোধের অর্থনৈতিক ভিত্তি চিনতেন না তা নয়।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বিজন গণনাট্য সঙ্ঘ ত্যাগ করার পর প্রথম যে পূর্ণাঙ্গ নাটক লেখেন, তার নাম ‘জতুগৃহ’। নাটকটি ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও আজ পর্যন্তও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। চার অঙ্কের এই নাটকের কাহিনী পারিবারিক। পরিবারের সদস্যরা হলেন কর্তার সময় ও তাঁর স্ত্রী সুহাস। তাঁদের তিনপুত্র কোম্পানীর উচ্চপদস্থ আধিকারিক, কংস, বাস্তুকার বীর আর ধনী হবার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল অমল, কন্যা কল্যাণী ও তার বৈজ্ঞানিক স্বামী অসীম এবং অমলের স্ত্রী লতা। এই সংসারে সবাই যেন পরস্পর বিরোধী মানসিকতা নিয়ে বিবদমান। প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত স্বার্থপরতায় আক্রান্ত। এই স্বার্থচিন্তাই দহনের রূপ নিয়ে পারিবারিক বিপর্যয় ঘটিয়েছে। এই দহন কল্যাণীর বিবাহ নিয়ে। কল্যাণীর বাঞ্ছিত প্রেমিক অসীম। অসীমকে জামাইরূপে পেতে চান রসময়ও। কিন্তু রসময়ের স্ত্রী সুহাস এবং তিনপুত্রের ইচ্ছা কল্যাণীর বিবাহ হোক বিশিষ্ট বিত্তশালী রঞ্জনের সঙ্গে। রঞ্জনের সঙ্গে বিয়ে হলে রসময়ের ছেলেরা তাদের ব্যক্তিগত আর্থিক স্বার্থ সিদ্ধির উপায় খুঁজে পাবে। এই পারস্পরিক স্বার্থ চিন্তা রসময়ের পরিবারে ঘটিয়ে দিল দহন যে দহনে তাঁর পরিবারে দেখা দিল দম্ভ জতুগৃহের করুণ ও নিষ্ঠুর প্রতিচ্ছবি। অতর্কিত মৃত্যুবরণ করলেন রসময় রঞ্জনের রিভালবার থেকে ছোঁড়া গুলিতে। রঞ্জন হত্যা করতে চেয়েছিল রসময়ের কনিষ্ঠপুত্র অমলকে, যে চরম আর্থিক দুর্বিপাকে জড়িয়ে পড়েছিল রঞ্জনের সঙ্গে। কিন্তু সেইগুলি বক্ষভেদ করে রসময়ের। তাঁর মৃত্যুবরণের সময় তাঁর স্ত্রী সুহাস বলেছিলেন—“পুলিশ এলে এর পরেও বলতে হবে আমার স্বামী স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছেন।”

জতুগৃহর সমাপ্তি ঘটেছে এই নাটকীয় শ্লেষ বর্যণে। নাট্যকারের সূক্ষ্মপর্যবেক্ষণ শক্তি তারিফ পাবার যোগ্য। নাটকটি অভিনীত হবার সুযোগ পায়নি।

‘গোত্রান্তর’ নাটকটি বিজন রচনা করে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। এই নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে জনৈক ছিন্নমূল উদাস্তু হরেন মাষ্টার। দেশবিভাগের পর ভিটে মাটি ত্যাগ করে হরেন মাষ্টার কলকাতার উপকণ্ঠে এসে কেমন করে শ্রমিকের জীবন বরণ করে নিয়ে বস্তিবাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন তারই কাহিনী বিবৃত হয়েছে গোত্রান্তরে। হরেন মাষ্টার তার শিক্ষকতা বৃত্তিকে ত্যাগ করে শ্রমিকে পরিণত হয়েছিলেন। এই পরিণতিই নাটকটির নামকরণের সার্থকতার দিকটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তিন অঙ্কের এই নাটকের প্রধান পাত্রপাত্রী হরেন মাষ্টার, তার স্ত্রী শংকরী, ভাই কেশবলাল এবং কন্যা গৌরী। উদাস্তু হয়েও হরেন তার আদর্শবাদী মানসিকতা বজায় রেখেও শেষপর্যন্ত জীবিকা নির্বাহের তাগিদে গ্রহণ করে শ্রমিকের জীবন। চাকুরিরত ভাই কেশবলাল যখন চাকরিহারা হয়ে অসহায় তখন হরেন কঠোর বাস্তবের সঙ্গে মোকাবিলায় শ্রমিক হয়ে গোত্রান্তরিত হয়েছিল।

নাটকের তৃতীয় অঙ্কে নাট্যসংঘাত চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। বস্তিমালিকের দালাল হরিধন যখন হরেনের যুবতী কন্যা গৌরীকে বিবাহ করতে চায়, তখনই সংঘাত সৃষ্টি হয়। মালিক বস্তি উচ্ছেদ করতে চাইলে গোয়াবাগান বস্তি শ্রমিক কানাইয়ের মা শৈল বুড়ি বস্তি রক্ষার আন্দোলনের সংকল্প বন্ধ হয় হরেন। কানাই ও গৌরী পরস্পর ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

গোত্রান্তর শেষপর্যন্ত নিছক উদাস্তু বিষয়ক নাটক নয়। গণনাটি চেতনাসমৃদ্ধ গোত্রান্তর সর্বহারা শ্রমিকের মেহনতি জীবনের নাটক। ক্যালকাটা থিয়েটারের প্রযোজনায় গোত্রান্তর নিউ এম্পায়ার মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয় ১৬ আগস্ট ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। পরিচালনা ও হরেনের ভূমিকায় অভিনয় করেন স্বয়ং নাট্যকার।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত একাঙ্ক মরাচাঁদ পূর্ণাঙ্গ নাটক হিসেবে প্রকাশিত হয় ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে। এই নাটকের মধ্যে বহু চরিত্রের ভিড়ে প্রধান ভূমিকায় রয়েছে অন্ধশিল্পী পবন অধিকারী। সে দোতারার বাদক। সে শিল্পীর স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। সে ছিল কেতকাদাস কীর্তনীর দলে বাঁধা মাইনের সংগীত শিল্পী। কিন্তু পবন গতানুগতিক এই বাঁধা মাইনের শিল্পী জীবন ত্যাগ করে সূর্যমন্ডলের সুরে বাঁধা সংগ্রামী শিল্প জীবন বেছে নেয়। এ ব্যাপারে তার প্রধান প্রেরণাদাতা জনসেবী শচীনবাবু। নাটকের প্রধান দ্বন্দ্বের আবির্ভাব ঘটে যখন পবন সংগ্রামী শিল্পীজীবন ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তার স্ত্রী রাধা এবং তার মাসী পবনের সিদ্ধান্তকে হঠকারী বলে মনে করেছিল। রাধা ও পবন যখন পরস্পর ভালোবাসার রঙিন সূত্রে আবদ্ধ হয়ে নতুন জীবনের স্বপ্নে বিভোর হয় তখন তাদের জীবনের আকাশে উদ্ভিত হয়েছে পূর্ণচাদের বিভা। কিন্তু সেই বিভা ধীরে ধীরে তার উজ্জ্বলতা হারাতে থাকে যখন রাধা পবনের জীবন থেকে সরে যায়। তখন পূর্ণচাঁদ রূপান্তরিত হয় মরাচাঁদে। রাধাহারা জীবন পবনকে নতুন করে বাঁচার মন্ত্রে দীক্ষিত করে। এই নতুন জীবন পবনের কাছে বঞ্চিত জীবনের ইশারা আনে। শচীন বাবুর উপদেশে পবন এই বঞ্চার অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে জনসংগীতের সুরে উদ্দীপিত হয়। তার কণ্ঠে শোনা যায়—‘বাঁচবো, বাঁচবো রে আমরা।’ বিজন পবনকে এঁকেছিলেন অন্ধশিল্পী টগরকে সামনে রেখে।

মরাচাঁদে আঁকা হয়েছে বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামের বাউল, বৈরাগী ও কৃষকের প্রচলিত জীবনাদর্শকে অবলম্বন করে। পবন একজন সহজিয়া বাউল। এই বাউল আত্মিক সংকটে দীর্ণ। এই দীর্ণতা কেমন করে পবন কাটিয়ে উঠল, তারই নাট্যাদর্শ প্রদর্শিত হয়েছে নাটকটিতে। অনেকের অভিমত মরাচাঁদের পবন শুধু অন্ধশিল্পী টগরের প্রতিলিপি নয়, নাট্যকারের নিজের জীবনেরও নিঃসঙ্গতার সংকট মোচনের নাটক। বিজন ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি সেমিনারে, ভাষণ দান কালে বলেছিলেন—“The crisis of the artist today is the crisis of the individual isolated from society. As the artist is able to generate a broad social understanding among the people, leading to an activization of the people against the forces of reaction.”

উদ্ধৃত ভাষণের মধ্যেই বিজন স্বীকার করলেন যে কোন শিল্পী তাঁর শিল্প চর্চায় অনুগত থাকবেন তাঁর প্রকাশের স্বাধীনতায়। পবনের প্রথাগত শিল্প চর্চার প্রয়াস থেকে সরে আসায় সেই স্বাধীনতাই ব্যস্ত হয়েছে।

নবান্নের মতো বিজনের নাট্যকার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা ‘দেবীগর্জন’। এই নাটক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু তার তিন বছর পূর্বে নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ ক্যালকাটা থিয়েটারের প্রযোজনায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (বর্তমানে সুবোধ মল্লিখ স্কোয়ার) অনুষ্ঠিত জাতীয় সংহতি সম্মেলন মঞ্চে। দেবীগর্জন ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কলঙ্ক একাঙ্কের প্রসারিত নাট্যরূপ।

দেবীগর্জন তিন অঙ্কের নাটক। বিভিন্ন দৃশ্য সন্নিবেশের মাধ্যমে এই নাটকে কৃষক বিদ্রোহের সূচনা ও স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। কেমন করে সেই বিদ্রোহ চূড়ান্ত আকার ধারণ করল তারই অগ্নিবর্ষী রূপায়ণ নাটকটিতে লক্ষ্য করা যাবে।

প্রথম অঙ্কে সর্দারের পরিবারের দুর্গতির চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই পরিবার সর্বস্বান্ত হয়েছে মহাজনের সুদের কারবারের ফাঁদে। জমিদার প্রভঞ্জন এইসব সর্বস্বান্ত পরিবারকে শোষণের দ্বারা চরম সর্বনাশের দিকে টেনে নিয়ে যায়। সে পঞ্জায়েত ব্যবস্থাকে ভেঙে তছনছ করে। অসহায় প্রজাদের সঙ্গে তার বিরোধ এইখানেই। সর্দারের পুত্র মংলা আরো শোষিত প্রজাদের নিয়ে আসে প্রভঞ্জনের খামার বাড়িতে প্রতিবাদ জানাতে। প্রভঞ্জনের পোষা লাঠিয়ালের লাঠির আঘাতে ধরাশায়ী হয় মংলা। মংলার চিকিৎসার ব্যাপারে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণে প্রভঞ্জনের তৎপরতা লক্ষ্য করার মত। মংলা ও রত্নার বিবাহে তখন সর্দারের পরিবারে দেখা দেয় কান্নার রোল। প্রভঞ্জনের কূটকৌশলে সর্দারের ভিটে মাটি নিলামে বেহাত হয়েছে। মংলার বউ রত্না পেয়েছে অপয়া বৌ-এর অভিশাপ। দ্বিতীয় অঙ্কে প্রভঞ্জন ও ত্রিভুবন মংলার বউ রত্নাকে কুক্ষিগত করার দুরভিসন্ধি আঁটে। মংলা সাঁওতাল চাষীদের নিয়ে সভা করে প্রভঞ্জন ও প্রভঞ্জনের স্তাবক ত্রিভুবনের বিরুদ্ধে ঐক্যবন্ধ আন্দোলনের উদ্দেশ্যে। তৃতীয় অঙ্কে যখন প্রভঞ্জন তার লোহার কারখানায় অভাবী মানুষদের কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বক্তৃতা করে তখন প্রজারা তাতে কর্ণপাত না করে প্রভঞ্জনের বিরুদ্ধে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে। রত্না প্রভঞ্জনের দ্বারা লাঞ্চিত হয় ও নিহত হয়। তার লাশ লুকিয়ে রাখা হয় ধানের গোলায়। মংলারা সভা করে প্রভঞ্জনের যাবতীয় খবরদারি বুখে দেয়। দেখা যায়, ধর্মগোলের অভ্যন্তরে পড়ে আছে রত্নার মৃতদেহ। প্রভঞ্জন পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে প্রজাদের হাতে। ক্ষুধ্ব ক্রুদ্ধ জনতা বাঁপিয়ে পড়ে প্রভঞ্জনের

উপর। নাট্যকার অবশেষে জানিয়েছেন, 'মহিাসুর বধের একটি চালচিত্রে পশ্চাতে বাঁধের ওপর মহাকালীর তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যে প্রভঞ্জন নিধন পালায় যবনিকা পড়ে।

কৃষিভিত্তিক বাংলায় শ্রেণীসংগ্রামের অনিবার্যতাকে দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছিলেন বিজন। ধর্মগোলা আর ধর্মঠাকুরের দোহাই দিয়ে গ্রামীণ জ্যোতদারের ও জমিদারী অসহায় চাষীর পরিবারে আনে অভাব ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়। কিন্তু চাষীরা একদিন চরম শোষণ ও যড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং ঐক্যবন্ধ আন্দোলনের ডাক দেয়। এই প্রতিরোধ আন্দোলনের কাছে একদিন হার মানে মহাজন আর জ্যোতদারের যাবতীয় দুরভিসন্ধি। চাষীরা নবজীবনের চেতনায় উদ্ভূত হয়। চেতনার এই উদ্বোধন গণনাট্যের প্রধান শর্ত। গণনাট্যের শর্ত মেনে দেবী গর্জন হয়েছে যথার্থ কৃষি বিপ্লবের নাটক।

১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত এবং গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত ধর্মগোলা পূর্ণাঙ্গ নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক নাটকটি অভিনীত হয়। কিন্তু নাটকটি সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য আর জানা যায় নি। কৃষ্ণপঙ্ক নাটক বিজন রচনা করেন ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই নাটক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। নাটক বিজনের নিজস্ব নাট্য দল কবচ কুণ্ডলের প্রযোজনায় রবীন্দ্রসদন মঞ্চে ১২ জানুয়ারি ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম অভিনীত হয়। নাটকটিতে কোন অঙ্ক বিভাজন নেই। পাঁচটি দৃশ্যে নাট্যকাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। দেবী মন্দিরকে খাড়া করে কেমন অসাধারণ চাতুর্যে ধর্মব্যবস্থা পরিচালিত হয় তারই কৌতুককর বিষয় নাটকটিতে বর্ণিত হয়েছে প্রথম দৃশ্যই নাট্যকার এনেছেন শিলাদেবী। এই মন্দিরের পূজারী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ কাশীনাথ বেদের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দ্বারা তপস্বীদের সংযত রাখার মসৃণ ব্যবস্থা গৃহীত হয়। মন্দিরের পবিত্র ভাব প্রদর্শিত হয় নানা বিচিত্র বাবাদের সহযোগিতায়। রাতের অন্ধকারে মন্দিরের সংগ্রহশালায় রক্ষিত ধান চালান হয়ে যায় সমাজের তথাকথিত ভদ্রঘরের নারী-পুরুষের সমবেত উপস্থিতিতে। চারিদিকে রটিয়ে দেওয়া হয় শিলাদেবী আর কেউ নন স্বয়ং যশোরেশ্বরী দেবী। এমন কি দেবী আধ্যাত্মিক মহিমার প্রচারের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা। মন্দিরের চাতালে আসে অন্ত প্রার্থীর দল। মন্দিরে আসেন দেশ-বিদেশের দর্শনার্থীরা। তারা স্ব-স্ব দেশে দেবী মহিমা প্রচারের দায় মাথা পেতে নেয়। জন নামের জনৈক বিদেশী পর্যটক দেবীর দুই দিকে স্থিত কেলো ও ভুলো নামের দুটি সাপকে দেখে বিস্মিত হয়। তারা দেখে অন্তপ্রার্থী বুড়ুক্ষদের। জন তাদের মনে করে কংগো ও ভিয়েতনামের মারমুখী জনতারূপে। মন্দিরে আসে সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ যারা কোনো না কোন ভাবে জীবনযুদ্ধে বিভ্রান্ত শোককাতর এবং অসহায় যন্ত্রণায় বিদ্ধ। তারা আশীর্বাদ চায় পুরোহিত কাশীনাথের। ধর্ম-ব্যবসার উদ্দেশ্যে আনা হয় তাকে এবং অন্যান্য বাবাদের! অবশেষে বুড়ুক্ষ দলের মানুষ চরম আক্রোশে শুরু করে বহুত্বসব। এতদিনে কৃষ্ণপঙ্কের কালিমার অবসান ঘটে। এইদিকে থেকে নাটকের নামকরণের সার্থকতা নির্ধারিত হয়।

কৃষ্ণপঙ্ক নাটকের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি হেনরিক ইবসেনের এনিমি অবদি পীপল-এর ছায়া। ধর্মীয় শোষণের ক্ষমতা বিরোধী পরিস্থিতি কেমন করে হঠান হল তাই বিজন দেখিয়েছেন কৃষ্ণপঙ্ক নাটকে। নাটকটি পাঁচটি দৃশ্যে বিভক্ত হয়ে নাটকের মৌল বিষয়টির নাট্যরূপায়ণ ঘটিয়েছে।

বিজনের জনপ্রিয় নাটক গর্ভবতী জননী রচিত হয়েছে ১৩৭৮ বঙ্গাব্দে। মুস্তাজান মঞ্চে এই নাটক প্রথম অভিনীত হয় ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে। বেদে জীবনের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কারকে কেন্দ্র করে এই নাটকের কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

অঙ্কের পরিবর্তে নাটকটি দুটি অংশে বিভক্ত। নাটকের পাত্রপাত্রীর তালিকায় রয়েছে সুধন্য, তার গর্ভবতী স্ত্রী কালী, সুবল, কন্দ, তার মা, মথরো, রতন, দাই মা প্রভৃতি। গর্ভবতী জননী নাটকে লোকাযত কৃষি জীবনের মাতৃভাবনার সঙ্গে জড়িত উর্বরতা সম্পর্কে বিশ্বাস সংস্কার যাদুমন্ত্রের প্রভাব ও নানাবিধ ক্রিয়াকর্মের পটভূমি বিস্তৃত হয়েছে।

বেদেদের জীবনযুদ্ধের নিপুণ চিত্র নাটকটিতে উপস্থাপিত হয়েছে। সারাদিন ধরে এরা বহু শারীরিক কষ্ট স্বীকার করে কন্দমূল সংগ্রহ করে সেগুলি তারা তুলে দেবে মহাজনের নৌকায়। পদ্ম নাল ও পদ্মফুল সংগ্রহের জন্য শিল্পী কল্প মহাজনের কাছ থেকে দানদান পায়। যথাসময়ে সেইসব সংগ্রহে ভাঁটা পড়লে তার কপালে জোটে তিরস্কার। বেদেরা এই কঠোর জীবন সংগ্রামেও বসায় বনবিবির পালা গান। নাটকের প্রথম অংশে আমরা এই জীবনের সঙ্গে পরিচিত হই। কিন্তু দ্বিতীয় অংশে আমরা দেখব কল্পকে সাপে কাটার করুণ দৃশ্য। কালীর গর্ভযন্ত্রণার চিৎকার শেষ হতেই জানা গেল, সে মৃত সন্তান প্রসব করেছে। পদ্মবনে গিয়েছিল কল্প পদ্মনালের সম্মানে। সেই পদ্মবনেই কল্পকে কাল সাপে কেটেছে। সে জীবন ফিরে পায়নি। মৃত সন্তান প্রসবের পর কালীর চৈতন্য ফিরিয়ে আনার জন্য ওঝা ঝাড় ফুক শুরু করে। কালীকে কল্পনা করা হয় উর্বরা শক্তির প্রতীকরূপে। কালীও প্রাণ দেয়। মামা এসে কালীর মৃতদেহের পদতলে রাখে ধানেরগুচ্ছ। নাট্যকার এই নাটকে লোকাযত কৃষি জীবনে নিহিত মাতৃতান্ত্রিক ধারণার উৎস ও উর্বরতা সম্পর্কে প্রচলিত লোকবিশ্বাসের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। দুঃখের বিষয় নাট্য পরিণতি সৃষ্টিতে নাট্যকার যথার্থ নাট্যসংহতি সৃষ্টি করতে পারেননি।

১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত সোনার বাংলা নাটকটি কবচ কুণ্ডলের প্রযোজনায় অভিনীত হয় ইডেন গার্ডেনে আয়োজিত বাংলাদেশ মৈত্রী পরিষদ মঞ্চে। এই বছরে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। তখনই গঠিত হয় বাংলাদেশ মৈত্রী পরিষদ। এই পরিষদের অনুবোধে নাট্যকার নাটকটি রচনা করেন। নাটকটির একটি প্রধান চরিত্রের নাম গাজী। নাট্যকার গাজীর চরিত্রে অবতীর্ণ হন। আজ বসন্ত রচিত হয় ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে। নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় আকাদেমী অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে (বর্তমানে লেডী রাণু মুখার্জি মঞ্চ)। তখন প্রযোজনায় ছিল ক্যালকাটা থিয়েটার। কিন্তু পরে নাটক ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২ মার্চ দ্বিতীয়বারের জন্য অভিনীত হয় রবীন্দ্রসদন মঞ্চে কবচ কুণ্ডলের প্রযোজনায়।

নাটকটিতে প্রেমের বিচিত্র পরিণতির রোমান্টিক দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে। নাটকটি তিন অংকবিশিষ্ট। অংকগুলি যথাক্রমে উদারা, মূদারা ও তারা নামে চিহ্নিত। নাট্য আজিকার রচনায় নাট্যকারের কল্পনায় স্বকীয়তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এখানে পাত্রপাত্রী চার জন মীরা, সুবিনয়, কেশরবাবু এবং উমেশবাবু। মীরা ও সুবিনয় ৭ বছর ধরে পারস্পরিক প্রেমের সম্পর্ক পাতিয়ে চলেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য সুবিনয়ের। সে কোন নির্ভরযোগ্য জীবিকার সন্ধান পাচ্ছে না। তার ফলে মীরার জন্য প্রেমপর্ব চালিয়ে যাওয়া তার কাছে অর্থহীন বলে বোধ হয়। অবশেষে সুবিনয় জার্মান কনসুলেটে ভ্রাম্যমাণের চাকরি পেয়ে দূরে চলে যায়। অপূর্ণ প্রেমের বেদনায় মীরা কলকাতার

লেকের জলে ঝাঁপ দেয়। কেদারবাবু তাকে উদ্ধার করে। কেদারবাবু ও উমেশবাবু দুজনেই উচ্চপদে চাকরির শেষে বর্তমানে অবসর প্রাপ্ত। তারা চান, সুবিনয় ও মীরা মরণের কাছে আত্মসমর্পণ না করে জীবনের এগিয়ে চলার পথের পথিক হোক। একটিমাত্র পার্কের দৃশ্যে নাট্যকাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে।

বিজ্ঞান ভট্টাচার্যের শেষ পূর্ণাঙ্গ নাটকের নাম চলো সাগরে। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত নাটকটি প্রথম অভিনীতি হয় ৩০ মার্চ ১৯৭৭ তারিখে তপন থিয়েটারে কবচ কুণ্ডলের প্রযোজনায়। পরিচালনা ও প্রধান চরিত্র সুরেন ডাক্তারের ভূমিকায় অভিনয় করেন স্বয়ং নাট্যকার। নাটকটি চারটি অঙ্কে বিভক্ত। তবে অংকগুলি তরঙ্গ নামে চিহ্নিত। সূত্রধারের ভূমিকায় রয়েছে মাদারি ও তার সহকারী জনৈক ছোকরা। প্রথম রঞ্জে ব্রিটিশ শাসনের অন্তিমকালের পটভূমিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহ পরিণতি নাট্যায়িত হয়েছে। এই দাঙ্গায় অসতর্ক মুহূর্তে পুত্রঘাতী ডাঃ সুরেনের মর্মান্তিক মনোবেদনার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে।

দ্বিতীয় তরঙ্গে উঠে এসেছে স্বাধীন ভারতবর্ষে কম্যুনিষ্ট পার্টির অবাঞ্ছিত অন্তর্বিরোধ। কম্যুনিষ্ট কর্মী বিভূতিকে সংশোধনবাদী আখ্যা দিয়ে পার্টিনেতা সাসপেন্ড করেন। মনোবেদনায় ও আত্মধিকারে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করলেও অবশেষে নিঃসঙ্গতা বৃকে গিয়ে বিভেদকামী পার্টি নেতার স্বরূপ জানার চেষ্টা করেন। তিনি আপন মনে আওড়ান, 'আজ বড় একা লাগছে, নিঃশব্দ লাগছে আমার, আমার ভয় করছে।'

তৃতীয় তরঙ্গে দেখা যাচ্ছে, কম্যুনিষ্ট দল ত্রিধা বিভক্ত হয়েছে। সর্বশেষ পার্টি বিভেদে আবির্ভাব ঘটেছে নকশালবাদী পার্টির। তরাই অঞ্চলের অরণ্য সংকুল গ্রামে পার্টি অফিস গড়ে সেখানে অবস্থান করছেন নকশাল নেতা প্রভাত মজুমদার ও তাঁর সাঁওতাল স্ত্রী কালিন্দী। পুলিশের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দেয় কালিন্দী। অতি সংগ্রামী সম্ভ্রাসবাদী চেতনার পরিণতি কি, সেসম্পর্কে নাট্যকার নীরব থাকলেও তাঁর মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠতে বিলম্ব করেনি।

চতুর্থ তরঙ্গে মালিক ও শ্রমিক বিরোধের প্রাণঘাতী পরিণতির দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে। এই বিরোধে প্রাণ দিয়েছে শ্রমিক নাগিনা। নাট্যকার দেখিয়েছেন শ্রমিকদের আন্দোলনেও এসেছে স্বার্থপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার নিষ্ঠুর দৃশ্য। নাগিনার মৃত্যুবরণে সেই শ্রমিক আন্দোলনের বিষময় পরিণতি লক্ষিত হয়।

নাটকটির নামকরণে নাট্যকারের মানবহিতাকাঙ্ক্ষার অকপট ইজিত স্পষ্ট হয়। নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে যাবতীয় বিভ্রান্তি কাটিয়ে ওঠা জনতার সুশৃঙ্খলিত মিছিলের দৃশ্যে। চারটি তরঙ্গের আপাত বিচ্ছিন্নতার সংযোগ সাধন করেছে মাদারি। এই চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকারের অসাধারণ নাট্যবোধের পরিচয় মেলে। নাটকের সংলাপে কথ্য হিন্দীর ব্যবহার চোখে পড়ার মত। মিছিলের অগ্রগতিতে স্পষ্ট হয়েছে মহাসাগরে যাবতীয় বিভ্রান্তির নদী মিলে মিশে একাকার হওয়ার মহা অঞ্জীকার। মানুষের স্বার্থে পার্টি। কিন্তু সেই পার্টি যদি নরম গরম তত্ত্বের বিবাদে মত্ত হয় তবে মানুষের হিতসাধনের প্রয়াস ব্যর্থ হয়। নাট্যকার এই ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠার প্রয়াসে নিরঙ্কুশ।

বিজ্ঞান একাঙ্ক নাটক রচনা করেছেন ৯টি। এগুলির নাম আগুন, জবানবন্দী, মরাচাঁদ, কলঙ্ক, জননেতা, সাগ্নিক, লাস ঘুইর্যা যাউক, চুল্লী ও হাঁসখালির হাঁস। আগুন একাঙ্ক ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে গণনাট্য সম্বন্ধে প্রযোজনায় প্রথম অভিনীত হয়। একাঙ্কটির কাহিনী মোট পাঁচটি দৃশ্যে সন্নিবিষ্ট।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিবেশে যখন পঞ্চাশের আকাল দেখা দিল, তখন সরকার খাদ্যাভাব মেটানর জন্য রেশন প্রথার প্রচলন করে। এই রেশন ব্যবস্থা কেমন করে অভাবী ক্ষুধার্থ নরনারীর জীবনে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে তারই করুণ নিষ্ঠুর চিত্র ব্যক্ত হয়েছে আগুন একাঙ্কে। রেশন দোকানের সামনে আগেভাগে গিয়ে লাইনে দাঁড়ানর জন্য শ্রমিক কৃষক দরিদ্র মানুষের মধ্যে পড়ে যায় হুড়োহুড়ি। বেলা যত বাড়ে তত লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের মধ্যে জাগে চাঞ্চল্য। অতর্কিতে সিভিক গার্ডের লোকেরা এক ব্যক্তিকে লাইন থেকে সরিয়ে দিলে চরম অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তখন এক যুবক আগুন বলে চিৎকার করে ওঠে। এই আগুন প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষুধার আগুন। এই দিক থেকে একাঙ্কটির নামকরণের সার্থকতা স্পষ্ট হয়।

বিজনের দ্বিতীয় একাঙ্ক জবানবন্দী রচিত হয় ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। একাঙ্কটি ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ জানুয়ারি গণনাট্য সম্বন্ধে প্রযোজনায় মিনার্ভা মঞ্চে প্রথমে অভিনীত হয়। চারটি দৃশ্য সমন্বিত এই একাঙ্কটিতে একটি গ্রাম্য কৃষক পরিবারের অভাবের তাড়নায় কলকাতায় আসা। একাঙ্কটিতে শিশু ও বৃদ্ধের মৃত্যুবরণ, এবং কৃষক বধূর সতীত্ব নাশের মর্মভূদ কাহিনীর বর্ণনা রয়েছে।

জবানবন্দীতে নবান্ন নাটকের আভাস বিদ্যমান। তবে এই একাঙ্কের সমাপ্তি করুণ রসাত্মক। পঞ্চাশের নবান্নর পরিসমাপ্তি ঘটেছে নতুন দিনের আশা ও উদ্দীপনায়। কৃষক পরিবারের বয়স্ক সদস্য পরাণ দুর্ভিক্ষের অনশন ক্লিষ্ট দিনে তার গ্রামের অন্যসব লোকের সঙ্গে চলে আসে কলকাতায়। কলকাতার ফুটপাথে ঘুরে ঘুরে কেমন করে তাদের দিন কাটে তারই নিষ্ঠুর নাট্য ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জাত কৃষক পরাণের কাছে এই ভিক্ষুক জীবন অসহ্য। পরাণের পুত্রবধূ খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে দেহ বিক্রয় করে। তখন বিভ্রান্ত পরাণ মরণের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে তার পুত্র এবং অন্য সবাইকে বলে—‘আমার সেই মরণে পড়া লাঙ্গলখানা আবার শক্ত করে চেপে ধরগে মাটিতে সোনা ফলবে, সোনা ফলবে।’ পরাণের এই জবানবন্দীর জন্য নাটকের নামকরণের সার্থকতা স্পষ্ট হয়। মরাচাঁদ ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ আলিপারকে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় ছাত্রসম্মেলনের মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়। এই একাঙ্ক শিল্পী মানুষের আদর্শ আঁকড়ে থাকার সংগ্রামের কথায় ভরা। কেতকা দাস কীর্তনীর কাছে বাঁধা বেতনের গতানুগতিকতায় হাঁপিয়ে ওঠে অন্ধ শিল্পী পবন। সে একদিন কেতকাদাসের কাজ ছেড়ে দিয়ে সংগ্রামে ভরা জীবনকে গড়ে তুলতে চায় সূর্য মস্তুর তালে। এব্যাপারে তার আদর্শ গণদরদী সমাজ সেবক শচীনবাবু। পবন ভালবেসে বিয়ে করেছিল রাধাকে। পবনের উপর অভিমান করে একদিন রাধা পবনকে ত্যাগ করে চলে যায় অন্য পুরুষের হাত ধরে। পবনের জীবন শূন্য হয়ে যায়। জীবনের এই হারানো দুঃখ পবন ভুলে থাকতে চায় গণ সংগীতের আসরে অংশ নিয়ে। সে গায় মুক্তির গান—‘বাঁচবো, বাঁচবো রে আমরা।’ পবন চরিত্রের মাঝে নিজেকে খুঁজে পান নাট্যকার। কেমন করে ব্যক্তিগত সংকট উত্তরণের পথ খোঁজে সমষ্টিগত জীবনের সংগ্রামী প্রেরণায় প্রতিবাদী সুরে তারই বলিষ্ঠ নাট্যরূপ মরাচাঁদ। রাধাকে বিয়ে করায় পবনের জীবনের আকাশে উঠে ছিল আনন্দের পূর্ণচাঁদ। রাধা চলে গেলে সেই চাঁদ তার উজ্জ্বলতা হারায়। তবু সেই মরাচাঁদ সংগ্রামী অভীক্ষায় উজ্জ্বলতার আশায় উদ্দীপ্ত হয়। এই ইতিবাচকতায় ভরা মরাচাঁদ একাঙ্ক। এই মরাচাঁদ একাঙ্ককেই বিজন পূর্ণাঙ্গ নাটকের রূপ দেন ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে। কলঙ্ক একাঙ্ক রচিত হয় ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে একাঙ্কটি ক্যালকাটা থিয়েটারের প্রযোজনায় ই. বি. আর. ম্যানশন

ইন্সটিটিউটে (বর্তমানে নেতাজী সুভাষ ইন্সটিটিউট) প্রথম মঞ্চস্থ হয়। কলঙ্কের পটভূমিতে রয়েছে বাঁকুড়া জেলার একটি সাঁওতাল পরিবারের নরনারী। এই পরিবারের কর্তা এক বৃদ্ধ মোড়ল। তার সংসারে আছে তার স্ত্রী গিরি পুত্র মঞ্জল আর তার বধূ রত্না। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। বাঁকুড়ার উক্ত সাঁওতাল পাড়ার অদূরে পড়ে সৈন্য ছাউনী। একদিন রত্না একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। সবাই দেখে পুত্রের গায়ের রং ধলা। সবাই কানাকানি করে সাঁওতালদের ঘরে গোরা সন্তান এল কেমন করে। পুত্রের জন্মের পরে যে সাঁওতাল পরিবারের ডাকে আনন্দের বাণ, অকস্মাৎ সেখানে নেমে আসে শোকের ছায়া। গোরা সন্তান গোরা সৈন্যের লোভের ফলশ্রুতি। এই সন্তান সাঁওতাল সমাজের কলঙ্ক। তখন গোরা সন্তানকে হত্যার নেশায় মেতে ওঠে সবাই। তখন বয়স্ক সাঁওতালরা সিদ্ধান্ত নেয় গোরা শিশুকে হত্যা করে কোনও সমস্যার সমাধান হবে না। গোরা সৈন্যদের বিরুদ্ধেই গড়ে তুলতে হবে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন।

জননেতা ও সাম্যিক একাঙ্ক দুটি তেমন উল্লেখযোগ্য নাট্য রচনা নয়। লাস ঘুইর্যা যাউক, চুল্লী এবং হাঁসখালির হাঁস তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ নাট্যপ্রয়াস। লাসঘুইর্যা যাউক ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। এই একাঙ্কের পটভূমিতে রয়েছে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিধ্বস্ত কলকাতা। সুরেন ডাক্তার এই দাঙ্গা দমনে তৎকালীন কলকাতার তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের নিষ্ক্রিয়তা দেখে ব্যথিত হন। একদা দাঙ্গার রাত্রিতে সুরেনবাবু প্রতিবেশীর কলেরা রোগগ্রস্তা স্ত্রীকে দেখতে যান। তাঁর পুত্র নানুও বেরিয়ে পড়ে রাত পাহারার কাজে। ইতিমধ্যে দাঙ্গার পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে পড়লে সুরেন লোহার রড নিয়ে অপেক্ষা করেন আক্রমণকারীর। এমন সময় নানু অন্ধকারের মধ্যে দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢুকতে গেলে সুরেন তাঁর হাতের রড দিয়ে আঘাত করেন নানুকে। প্রতিবেশিরা নানুর মৃতদেহ নিয়ে মিছিলে বেরিয়ে সুরেনবাবু তাঁর মরা ছেলের মৃত মুখ না দেখার মনোভাবে বলে-লাস অন্য পথে যাবে। বলা হল লাস ঘুইর্যা যাউক। সুরেন সমস্ত ব্যাপারটি অনুধাবন করে পুত্র শোকে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। এইখানেই একাঙ্কটির সমাপ্তি। চুল্লীর রচনাকাল ১৯৭২-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৭০-এর দশকে যে হত্যার রাজনীতি শুরু হয়, তারই পটভূমিকায় একাঙ্কটি রচিত। এই একাঙ্কের পটভূমিতে রয়েছে একটি শ্মশান। এই শ্মশানে আছে বৈদ্যুতিক ও কাঠ উভয়ধরনের চুল্লী। শবদেহকে কেন্দ্র করে ডোমেরা অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জন করে। শবদাহের জন্য আনা হয়েছে দুটি শব। একটি যুবক নেতা পল্লব সেনের এবং অন্যটি পল্লবের গুলিতে নিহত জ্যোতদার নটবর হালদারের। চুল্লীতে বসেছে একটি কাল্পনিক বিচারালয়। এখানকার বিচারক স্বয়ং চুল্লী। রাজনৈতিক ঝাণ্ডা ডাঙায় পরিণত হয়ে যে বিষাক্ত পরিস্থিতি বিরাজমান হয়েছে সারা দেশে, তারই বিচার বসেছে আদালতে। শ্মশানে আগত নুলো কেইট, লুলু, কালী পাগলিনী, ভিখারীদের মধ্যে বিরাজমান মামা নামক একটি চরিত্র। এই চরিত্রটি নাট্যকারের প্রতিনিধি স্থানীয়। মামা বহুদর্শী। সে নুলোদের অভিভাবক। বিজনের নাটকে মামা জাতীয় বহু অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ চরিত্রের দেখা মেলে। গর্ভবতী জননীতেও মামা আছে। সেই মামা লোকায়ত দর্শনে প্রাজ্ঞ। একাঙ্কটিতে সুসংহত নাট্যকাহিনী লক্ষ্য করা যায় না। হাঁসখালির হাঁস ১৯৭৪-৭৭-এ রচিত। এই একাঙ্কটি যখন বিজন লেখেন, তখন কলকাতায় পাতাল রেলের জন্য মাটি কাটা চলছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেক মানুষ এসেছিল মাটি কাটার কাজে। কাজের স্থানে আসা মানুষগুলির ভাগ্য যেন চিরন্তন দুর্ভাগ্য পীড়িত মানব ভাগ্যেরই দ্যোতনা জাগায়। সেই স্মরণাতীত পৌরাণিক যুগের কাল পেরিয়ে এই ভাগ্য বিড়ম্বিত

মানুষের মিছিল যেন প্রত্যক্ষ করেন বিজন মাটি কাটতে আসা মেহনতি মানুষের মিছিল দেখে। তারা নিজেদের কল্পনা করে মানুষের জঞ্জালরূপে। এখানেও আছে মামা চরিত্র। সে অভিজ্ঞ নানা প্রত্যয়ী মানসিকতায়। মাটি কাটতে আসা লোকগুলি সর্বহারা শ্রেণীর। মামা এইসব মানুষকে সতর্ক থাকতে বলে বাবু শ্রেণী সম্পর্কে এবং সেই সঙ্গে নিজেদের ভেতরকার নানা স্ববিরোধিতা সম্পর্কেও। শ্রেণী শোষণের নির্মমতা সম্পর্কেও নাট্যকার সচেতন থাকার ব্যাপারে সমাগত মানুষদের সতর্ক করতেও দ্বিধা করেন না।

নট ও নাট্য পরিচালক বিজনের পরিপূর্ণ পরিচয় তাঁর নাট্য রচনার মধ্যেই ব্যক্ত হয়েছে। তিনি নিপীড়িত মানুষের নাট্যরূপকার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, আগষ্ট আন্দোলন, দাঙ্গা, দেশভাগ, মার্কসবাদী আন্দোলন এবং তার স্ববিরোধী প্রকৃতি, পেটি বুর্জোয়া নেতার বামপন্থী ভণ্ডামি, অতিবিপ্লবী বামপন্থী রাজনীতির ভয়াবহতা সবই বিজন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর নাট্য সমগ্র তারই প্রতিরূপ। তাঁর নাট্যবীক্ষা তাঁর জীবন বীক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। এই প্রতিফলনে তিনি যত অকপট থেকেছেন, ততই তিনি শিকার হয়েছেন হতাশা ও বিভ্রান্তির। শতাব্দী পেরিয়ে এসে বাংলা নাট্য রচনার ধারার পরিমাপ করতে রসে বিজন ভট্টাচার্যকে জানার চেষ্টা বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করবেই। বিজনের নাট্য সমগ্র দেশবাসীর হাতের নাগালের বাইরে। তাঁর নাট্য ব্যক্তিত্বের উদ্ঘাটনে তাই প্রবল প্রতিরোধ পাহাড় প্রমাণ অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।